# বৈতরবাংলা

অগ্নিঝরা মার্চ ২০২৪

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের কাছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধিদল কমিশনের '৪৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২' হস্তান্তর করেন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

# বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

অগ্নিঝরা মার্চ ২০২৪

**আঞ্চলিক পরিচালক**
মর্জিনা বেগম

**সম্পাদক**
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

**বিজনেস ম্যানেজার**
মোঃ শরিফুর রহমান

**সহ সম্পাদক**
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

**প্রচ্ছদ**
এ.কে.এম. ফজলুর রহমান

**আলোকচিত্র**
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

**মুদ্রণ সংশোধক**
মো: হাসান সরদার

**প্রকাশক**
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

**বেতার প্রকাশনা দপ্তর**
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

**নামলিপি**
কাইয়ুম চৌধুরী

**মূল্য**
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

**প্রোডাকশন**
দশদিশা প্রিন্টার্স


## সম্পাদকীয়

'শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
.....
গণসূয্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। বাঙালির গণজাগরণের দিন। নিজকে চেনার দিন। বঙ্গবন্ধুর অমোঘ এই বাণী পরাধীনতার গ্লানি জর্জরিত তৃষ্ণার্ত খেটে খাওয়া মানুষকে পরম ভালোবাসায় একিভূত করেছে, দিয়েছে প্রত্যয় আর নির্ভরতা, দেখিয়েছে স্বপ্ন। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তারই ধারাবাহিকতা আজও চলমান স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথপরিক্রমায়।

১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী। স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনের সেই শিশু মুজিবের ভিতরেই সুপ্ত ছিল বাংলার স্বাধীনতা। তিনি অনাগত শিশুদের জন্য দিয়ে গেছেন নিরাপদ ভূমি, বাংলাদেশ। আজকের শিশুই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার কারিগর।

২৬শে মার্চ। ইতিহাসের এক দুর্গম পথ বেয়ে এদিন আমরা পৌঁছেছিলাম স্বাধীনতার বন্দরে। সেদিনের নৃশংসতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব বেশি নেই। বাঙালির ওপর জেঁকে বসা পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন -সংগ্রামের পথপরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি মুক্তিসংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন। একাত্তরের ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় ও বঙ্গবন্ধুকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের পূর্বে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেন। শত আঘাতে সেদিন জেগে উঠেছিল বাংলার প্রতিটি মানুষ। তৈরি হয়েছিল আত্মাহুতি দিতে। বহু রক্ত, অশ্রু, স্বেদ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জনের এই স্মৃতি মনের গহিনে লালন করে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্পই হোক আমাদের আজকের অঙ্গিকার।

# সূচিপত্র



## প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

বঙ্গবন্ধুর গণমুখী উন্নয়ন ভাবনা
ড. আতিউর রহমান — ৪

৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক
মোহাম্মদ শাহজাহান — ৮

জাতীয় শিশুদিবস ও বঙ্গবন্ধুর শিশু আইনের ধারাবাহিকতা
রফিকুর রশীদ — ১৬

স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ বেতার
কাওসার চৌধুরী — ১৮

বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যই আমার জীবনের পাথেয় (পর্ব-১)
মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু — ২২

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা (পর্ব-১)
ড. মোহাম্মদ হাননান — ২৮

মক্তিযুদ্ধকালীন রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের শহিদগণ
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক — ৩৪

স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক
কে সি বি তপু — ৪২

## গল্প

মানুষের ডেরায় স্বপ্নের খুঁটি
সেলিনা হোসেন — ১২

তমিজা খালার হেঁশেল
শেলী সেনগুপ্তা — ৩৮

মুক্তিযোদ্ধাদের সংকেত
ইমরুল ইউসুফ — ৪০

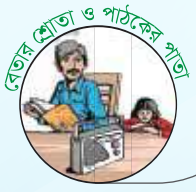


৯৪

## কবিতা

একটি সূর্যের গল্প
রবীন্দ্র গোপ — ৭

বঙ্গবন্ধু
শাহজাদী আঞ্জুমান আরা — ৭

কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু
মিলন সব্যসাচী — ১১

স্বপ্নের পতাকা
সোহরাব পাশা — ১১

উদ্যত তর্জনীর কবিতা
জান্নাতুল বাকেয়া কেকা — ২১

আমি বাঙালি
শেখ ফয়সল আমীন — ২১

আমি চোখ করেছি আয়না
শরীফ সাথী — ২৭

স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত
নকুল শর্ম্মা — ২৭

বীরাঙ্গনা মা
শরিফুল আলম — ৩৭

তুমি ছিলে তুমি আছ
মিয়া সালাহউদ্দিন — ৩৭

## তরুপল্লব

এক মুজিবেই সফল হলো
অপু বড়ুয়া — ৪৫

একটি খোকা
কাজল নিশি — ৪৫

শেখ মুজিবুর
লাবনী খানম — ৪৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা তৈয়বের বড়ো কাকু
বেগম শামসুন নাহার — ৪৬

মুক্তদেশ
এস ডি সুব্রত — ৪৯

আরোধিত কবিতা একাত্তরের
ফারুক আলমগীর — ৪৯

স্বাধীনতার সুখ
মমতা মজুমদার — ৪৯

মুক্তিযোদ্ধা রাবেয়া
আহমেদ রিয়াজ — ৫০

বেতার পর্ব

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা — ৫৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা — ৬৪

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা — ৭৮

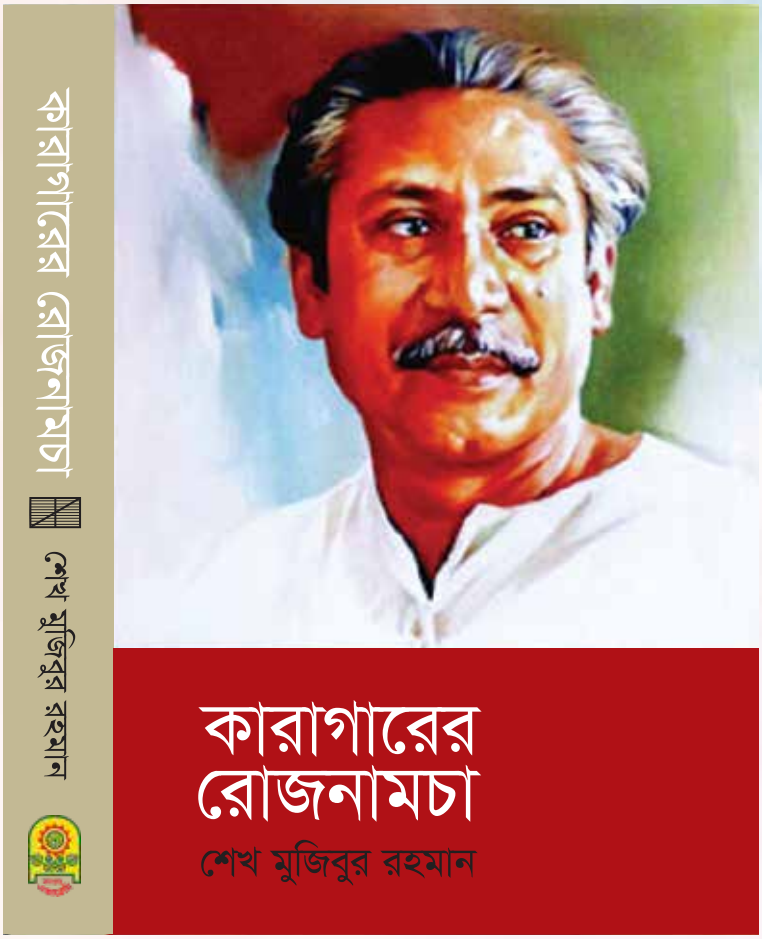


# কারাগারের রোজনামচা

## শেখ মুজিবুর রহমান

**১৭ই** মার্চ ১৯৬৭

আজ আমার ৪৭ তম জন্মবার্ষিকী। এই দিনে ১৯২০ সালে পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট পল্লীতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্মবার্ষিকী আমি কোনোদিন নিজে পালন করি নাই-বেশি হলে আমার স্ত্রী এই দিনটাতে আমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিয়ে থাকত। এই দিনটিতে আমি চেষ্টা করতাম বাড়িতে থাকতে। খবরের কগজে দেখলাম ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ আমার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। বোধ হয়, আমি জেলে বন্দি আছি বলেই। 'আমি একজন মানুষ, আর আমার আবার জন্মদিবস'! দেখে হাসলাম। মাত্র ১৪ তারিখে রেণু ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেখতে এসেছিল। আবার এত তাড়াতাড়ি দেখা করতে অনুমতি কি দিবে? মন বলছিল, যদি আমার ছেলেমেয়েরা ও রেণু আসত ভালই হত। ১৫ তারিখেও রেণু এসেছিল জেলগেটে মণির সাথে দেখা করতে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি নূরে আলম - আমার কাছে ২০ সেলে থাকে, কয়েকটা ফুল নিয়ে আমার ঘরে এসে উপস্থিত। আমাকে বলল, এই আমার উপহার, আপনার জন্মদিনে। আমি ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম। তারপর বাবু চিত্তরঞ্জন সুতার একটা রক্তগোলাপ এবং বাবু সুধাংশু বিমল দত্তও একটি শাদা গোলাপ এবং ডিপিআর বন্দি এমদাদুল্লা সাহেব একটা লাল ডালিয়া আমাকে উপহার দিলেন।

আমি থাকি দেওয়ানী ওয়ার্ডে আর এরা থাকেন পুরানা বিশ সেলে। মাঝে মাঝে দেখা হয় আমি যখন বেড়াই আর তারা যখন হাঁটাচলা করেন স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য।

খবরের কাগজ পড়া শেষ করতে চারটা বেজে গেল। ভাবলাম 'দেখা' আসতেও পারে। ২৬ সেলে থাকেন সন্তোষ বাবু, ফরিদপুরে বাড়ি। ইংরেজ আমলে বিপ্লবী দলে ছিলেন, বহুদিন জেলে ছিলেন। এবারে মার্শাল ল' জারি হওয়ার পরে জেলে এসেছেন, ৮ বৎসর হয়ে গেছে স্বাধীনতা পাওয়ার পরে প্রায় ১৭ বৎসর জেল খেটেছেন। শুধু আওয়ামী লীগরে ক্ষমতার সময় মুক্তি পেয়েছিলেন। জেল হাসপাতালে প্রায়ই আসেন, আমার সাথে পরিচয় পূর্বে ছিল না। তবে একই জেলে বহুদিন রয়েছি। আমাকে তো জেলে একলাই অনেকদিন থাকতে হয়েছে। আমার কাছে কোনো রাজবন্দিকে দেওয়া হয় না। কারণ ভয় তাদের আমি 'খারাপ' করে ফেলব, নতুবা আমাকে 'খারাপ' করে ফেলবে। আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, ২৬ সেলে যাবেন। দরজা থেকে আমার কাছে বিদায় নিতে চান। আমি একটু এগিয়ে আদাব করলাম। তখন সাড়ে চারটা বেজে গিয়েছে, বুঝলাম আজ বোধ হয় রেণু ও ছেলেমেয়েরা দেখা করার অনুমতি পায় নাই। পাঁচটাও বেজে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে জমাদার সাহেব বললেন, চলুন আপনার বেগম সাহেবা ও ছেলেমেয়েরা এসেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে রওয়ানা করলাম জেলগেটের দিকে। ছোট মেয়েটা আর আড়াই বৎসরের ছেলে রাসেল ফুলের মালা হাতে করে দাঁড়াইয়া আছে। মালাটা নিয়ে রাসেলকে পরাইয়া দিলাম। সে কিছুতেই পরবে না, আমার গলায় দিয়ে দিল। ওকে নিয়ে আমি ঢুকলাম রুমে। ছেলেমেয়েদের চুমা দিলাম। দেখি সিটি আওয়ামী লীগ একটা বিরাট কেক পাঠাইয়া দিয়াছে। রাসেলকে দিয়েই কাটালাম, আমিও হাত দিলাম। জেল গেটের সকলকে কিছু কিছু দেওয়া হলো। কিছুটা আমার ভাগ্নে মণিকে পাঠাতে বলে দিলাম জেলগেটে থেকে। ওর সাথে তো আমার দেখা হবে না, এক জেলে থেকেও।

আর একটা কেক পাঠাইয়াছে বদরুন, কেকটার উপর লিখেছে 'মুজিব ভাইয়ের জন্মদিনে'। বদরুন আমার স্ত্রীর মারফতে পাঠাইয়াছে এই কেকটা। নিজে তো দেখা করতে পারল না, আর অনুমতিও পাবে না। শুধু মনে মনে বললাম,'তোমার স্নেহের দান আমি ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করলাম। জীবনে তোমাকে ভুলতে পারব না।' আমার ছেলেমেয়েরা বদরুনকে ফুফু বলে ডাকে। তাই বাচ্চাদের বললাম, 'তোমাদের ফুফুকে আমার আদর ও ধন্যবাদ জানাইও'।

ছয়টা বেজে গিয়াছে, তাড়াতাড়ি রেণুকে ও ছেলেমেয়েদের বিদায় দিতে হলো। রাসেলও বুঝতে আরম্ভ করেছে, এখন আর আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। আমার ছোট মেয়েটা খুব ব্যথা পায় আমাকে ছেড়ে যেতে, ওর মুখ দেখে বুঝতে পারি। ব্যথা আমিও পাই, কিন্তু উপায় নাই। রেণুও বড় চাপা, মুখে কিছুই প্রকাশ করে না।

ফিরে এলাম আমার আস্তানায়। ঘরে ঢুকলাম, তালা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে। ভোর বেলা খুলবে।

# বঙ্গবন্ধুর গণমুখী উন্নয়ন ভাবনা

ড. আতিউর রহমান

আবার এসেছে স্বাধীনতার মাস। এ মাস এলেই বাঙালি বারবার স্মরণ করে স্বাধীনতার মহান স্থপতিকে। বাঙালি জাতি স্মরণ করে জাতির পিতার নানামাত্রিক অবদানের কথা। সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে তাঁর জনকল্যাণ ভাবনা ও উদ্যোগসমূহকে। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের জন্যে তিনি ছিলেন অন্তপ্রাণ। তাই স্বাধীনতার এই মাসে তাঁরা ভাবেন এদেশটি আরও কত আগেই না অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নের স্বাদ পেত যদি না বঙ্গবন্ধুকে হঠাৎ এমন করে চলে যেতে না হতো। যদিও তাঁর সুকন্যা পরবর্তী পর্বে এসে গরিব-দুঃখীর দুঃখ মোচনের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, তবুও মাঝখানে অনেকগুলো বছর হারিয়ে গেছে জাতির জীবন থেকে। আর ওই সময়ে গরিব-বিদ্বেষী যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেসব পরিবর্তন করে স্বদেশকে ফের বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে ফিরিয়ে আনা মোটেও সহজ ছিল না। এখনো রয়ে গেছে অনেক চ্যালেঞ্জ। সব আবর্জনা দূর করে সমৃদ্ধির পথে স্বদেশকে এগিয়ে নেওয়া মোটেও সহজ নয়। আর দ্রুত বেড়ে ওঠা অতি ধনীদের কারসাজি এড়িয়ে সাধারণের কল্যাণে নিবেদিত থাকাও বেশ কষ্টসাধ্য। এমনি এক বাস্তবতায় আমরা স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণের অর্থনৈতিক নীতিকৌশলকে।

স্পষ্টতই বঙ্গবন্ধুর প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্যই ছিল এদেশের গরিব-দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। এ কারণে আমরা দেখতে পাই সেই ছোট্টবেলা থেকেই এবং পরবর্তীতে তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেখানে গিয়েছেন সেখানেই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন - মানুষের উন্নয়নে কথা। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মাঝে বরাবরই প্রস্ফুটিত হয়েছে এটি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার পান এদেশের সাধারণ জনগণ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে তিনি বিরাট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উন্নয়ন দর্শনে তিনি প্রথমেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। একই সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান-প্রণয়ন, এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) পুনর্গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, নতুন ১১ হাজার প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ মোট ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুস্থ মহিলাদের কল্যাণে নারী-পুনর্বাসন ব্যবস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ প্রায় ৩০ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণ, কৃষকদের মাঝে দেড় লাখ গাভি ও ৪০ হাজার সেচপাম্প বিতরণ এবং ব্যাপক কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্যে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। এ ছাড়াও বিনা/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের

মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক-বিমার ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও সেসব চালুর মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বঙ্গ শিল্পকারখানা চালুসহ একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সাফল্য। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই দেশ পুনর্গঠনে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ, পুরো দেশবাসীকে এ কাজে উজ্জীবিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া পদক্ষেপসমূহ আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ব্রিজ, কালভার্ট, সেতু নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, দক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, উত্তর-দক্ষিণ শীতল রাজনৈতিক মেরুকরণে দেশকে 'জোট নিরপেক্ষ– সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করা, পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন, আদমশুমারি ইত্যাদি কর্মপ্রয়াসে বঙ্গবন্ধু উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন স্বদেশকে। তাঁর শোষণহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নের জমিনের বড়ো অংশ জুড়েই ছিল বাংলাদেশের কৃষক। সারা বাংলাদেশের হৃদয়কে এক করার নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি কৃষকদের চাওয়া-পাওয়াকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। গরিবহিতৈষী বঙ্গবন্ধু সেজন্যেই স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কৃষকদের দিকে নজর দেন। তিনি সবসময় বলতেন, 'আমার দেশের কৃষকেরা সবচাইতে নির্যাতিত।' কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্যে তিনি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। উন্নত বীজ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। পঞ্চাশের দশকে তাঁকে দেখেছি পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কৃষকের পক্ষে কথা বলতে, ষাটের দশকে দেখেছি ছয় দফার আন্দোলনে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সোচ্চার হতে। আর স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দেখেছি সর্বক্ষণ কৃষক অন্তপ্রাণ বঙ্গবন্ধুকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখের ভাষণেও এদেশের কৃষক-সমাজের অধিকার সংরক্ষণের কথা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন দ্ব্যর্থহীনভাবে। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর পর বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তাতে কৃষকদের জন্যে অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না।'

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহ জরুরি ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্যে ধানবীজ, পাটবীজ ও গমবীজ সরবরাহ করা হয়। দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয় ও তাঁদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করে দেওয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়। ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। গরিব কৃষকদের বাঁচানোর স্বার্থে সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন সুবিধা তাদের আয়ত্তে নিয়ে আসা হয়। বঙ্গবন্ধু প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য নিবারণের তাগিদে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের পর্যায়ে আনা হয়। ওই সময় দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। বিরাজমান খাসজমির সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য জমির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্যে বঙ্গবন্ধু পরিবার পিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করে দেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রাথমিক হিসেবে ৩০ লক্ষ টন। তাৎক্ষণিক আমদানির মাধ্যমে এবং স্বল্প মেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ সরবরাহ করে এবং কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাসজমি বিতরণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টনের ফরমুলা নির্ধারণে অত্যন্ত জোরদার উদ্যোগ নেন। এর ফলে ভাটির দেশ হিসেবে গঙ্গার পানির ৪৪ হাজার কিউসেক হিস্সা পাওয়ার সম্মতি তিনি আদায় করেন। ১৯৬৮-৬৯ সালের ১১ হাজার শক্তিচালিত পাম্পের স্থলে ১৯৭৪-৭৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ হাজার। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। বাংলার কৃষককে সারে ভরতুকি দিয়ে রক্ষা করেন বঙ্গবন্ধু। গঙ্গা নদীর প্রবাহ থেকে অধিক পানি প্রাপ্তি, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, অতিরিক্ত খাসজমি প্রাপ্তি এবং মূল্য সমর্থনমূলক সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা বজায় রয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা সেই ধারাকে আরও বেগবান করেছেন।

কৃষি ও কৃষকের উন্নতি, বিশেষ করে অধিক ফসল উৎপাদন, সেই সঙ্গে উৎপাদিত কৃষিপণ্য কৃষকরা যাতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে পারেন সেদিকে বঙ্গবন্ধুর সুদৃষ্টি ছিল। সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ খুব বেশি না থাকলেও এগুলোর

প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন। কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেচ, সার, বীজ ইত্যাদি ব্যবহারে কৃষকদেরকে তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগাতে বলতেন। জেলা-গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কৃষি ও কৃষকদের প্রতি নজর দেওয়ার জন্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষিই যেহেতু এ দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস, সেহেতু কৃষির উন্নতিই হবে দেশের উন্নতি।

৭২ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বেতার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়, আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্তি নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলব। এবং জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকীকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি শুভ সূচনা হিসেবে আমার সরকার উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতীয়করণ করেছে।

১. ব্যাংকসমূহ (বিদেশি ব্যাংকের শাখাগুলো বাদে), ২. সাধারণ ও জীবন বিমা কোম্পানিসহ (বিদেশি বিমা কোম্পানির শাখাসমূহ বাদে), ৩. সকল পাটকল, ৪. সকল বস্ত্র সুতাকল, ৪. সকল চিনিকল, ৫. অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-যানের বৃহদাংশ, ৬. ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তদূর্ধ্ব সকল পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি, ৭. বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে সরকারি সংস্থা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে এবং ৮. সমগ্র বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণের লক্ষ্য নিয়ে সাময়িকভাবে বহির্বাণিজ্যের বৃহদাংশকে এই মুহূর্তে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।'

ওই দিন তিনি আরও বলেন, সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে। এবং উচ্চতর আয় ও নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বী বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করার ব্যবস্থাদি উদ্ভাবনের জন্যে আমি একটি বিশেষ কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করছি। আজ আমরা বিশ্ব সভ্যতার এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। একটি নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা বিভোর, একটি সামাজিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা অটল, আমাদের সমস্ত নীতি– আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ কাজে নিয়োজিত হবে। আমাদের দুস্তর পথ। এ পথ আমাদের অতিক্রম করতেই হবে।'

**বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখের ভাষণেও এদেশের কৃষক-সমাজের অধিকার সংরক্ষণের কথা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন দ্ব্যর্থহীনভাবে।**

তবে শুরুতে রাষ্ট্রীয় খাতকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পায়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করলেও ধীরে ধীরে তিনি ব্যক্তিখাতের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হন। তাই ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ড. এ আর মল্লিক উল্লেখ করেন যে, "পুঁজি বিনিয়োগে বেসরকারি উদ্যোক্তাদিগকে যথাযথ ভূমিকা পালনে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য এবং বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে, সরকার চলতি অর্থবৎসরের শুরুতে বেসরকরি পুঁজি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ২৫ লক্ষ হইতে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করেন এবং বেসরকারি খাতে কয়েকটি নতুন শিল্প গড়িয়া তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (বাজেট বক্তৃতা, ১৯৭৫-৭৬, পৃ: ৫)। তাছাড়া ১৩৩টি পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, ৮২টি ব্যক্তিমালিকানায় ও ৫১টি কর্মচারী সমবায়ের নিকট বিক্রি করা হয়। এভাবেই তাঁর জীবদ্দশাতেই শিল্পায়নকে 'ডিরেগুলেট' করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রক্রিয়া বেগবান হয়। ধীরে ধীরে ব্যক্তিখাত শিল্পায়নের মূল চলিকাশক্তিতে আবির্ভূত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত: ব্যক্তিখাত নির্ভর হলেও তাকে সহায়তার জন্যে জ্বালানিসহ মেগা অবকাঠামো খাত সরকারি বিনিয়োগেই গড়ে উঠেছে। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ ঘিরেই দেশে উল্লেখ করার মতো প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হচ্ছে। সর্বশেষ অর্থবছরে আমরা ৮.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। চলতি অর্থবছরে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ৮.২০ শতাংশ। শুধু প্রবৃদ্ধি নয় এদেশের বঞ্চিতজনদের জন্য ব্যাপক অঙ্কের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অতি দারিদ্র্যের হার আগামী কয়েক বছরেই কমিয়ে পাঁচ শতাংশের আশেপাশে আনার ঘোষণা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে গরিব-দুঃখী সবাই এখন ব্যাংকিং লেনদেন করতে পারছেন। ডিজিটাল ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে স্বস্তি। বড়ো বড়ো অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে জনজীবনে আরও স্বস্তির সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। মধ্যবিত্তের জীবন চলা এখনো বেশ চাপের মুখেই রয়ে গেছে। মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল রেখে সবার জন্য গুণমানের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ আরও বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। তবে সেজন্যে চাই সার্বিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। রাজনৈতিক ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখা গেলে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জয়যাত্রা নিশ্চয় অব্যাহত রাখা যাবে। আর তাহলেই বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবেন।

*লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর*

## একটি সূর্যের গল্প

রবীন্দ্র গোপ

প্রতিবার ভাঙনের শেষে একটি সূর্য ওঠে
রক্তের সাগর উথালপাতাল, দাঁড়ায় একটি সূর্য
আঁধার আচ্ছন্ন কাল থেকে নিশিলাগা কাল থেকে
একটি সূর্য দাঁড়ায় এসে আমাদের শিয়রের পাশে
বত্রিশের সিঁড়িতে এক সাগর রক্তের মাঝে
ফুটে ওঠে এক সূর্য
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আলো দিয়ে যায় সূর্য।
প্রতিবার ঝরের তাণ্ডবে
তোমাকে স্মরণ করি,
হে সূর্য,
হে স্বাধীনতা
হে মুজিব
হে পিতা।
আমাদের রক্তের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
তোমারই দোলা লাগে প্রাণে প্রাণে
আকুল করা মাঝির প্রাণে
বটের ছায়ায় রাখালের গানে
যতবার ভাবি আমি তোমাকে বিদ্রোহে-বিপ্লবে
ততবার তুমি আমার প্রাণে প্রাণে দোলা দিয়ে যাও।

হৃদয়ের আঁধার ঘরে তুমিই জ্বালিয়ে দাও
দীপ্ত প্রদীপ শিখা
আমাদের বিদ্রোহের প্রতীক তুমি
তুমি আমার স্বাধীনতা ।

## বঙ্গবন্ধু

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

তোমার জন্মই আজ আমাদের স্বাধীনতা
তুমি জন্মেছিলে তাই কবিতা সেজেছে স্বাধীন সত্তায়
আজ আলোকিত সমগ্র বাংলাদেশ
শতবর্ষ পরে টুঙ্গিপাড়ার সে ঘর থেকে।

বঙ্গবন্ধু, মধুমতি ছিল কি একটু বেশি স্রোতময়
যখন তোমার জন্মধ্বনি বেজেছে দুয়ারে?
দোয়েল, শালিক ছিল চঞ্চল ভীষণ
গাঢ় অক্সিজেন ছিল বাতাসে তখন?
ধুলো মাটি মেখে কৃষকের পথ চলা
ছিল কি একটু দৃপ্ত সাহসে তখন?

বাতাস, নদীর ঢেউ, সবাই জানে, জানে সেই কৃষক
পথ ভোলা ক্ষণিক পথিক
টুঙ্গিপাড়ার বাতাস কেন এত আলোড়িত
তুমি জন্মেছিলে বলে
তুমি জন্মেছিলে বলে আজ হয়েছে আমাদের নিজস্ব পরিচয়
সে আমাদের বাংলাদেশ।

# ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক

মোহাম্মদ শাহজাহান

৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন। বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৫৫ বছরের জীবনে শত শত ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু বঙ্গবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণের একটি হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাকিস্তানের জেনারেলরা পর্যন্ত বলেছেন– 'প্রকৃতপক্ষে ৭ই মার্চই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।'

ভাষণটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি চরণ দিয়ে একটি আলাদা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। এমন উত্তেজনাপূর্ণ বিপরীতমুখী পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে যেভাবে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, এর কোনো তুলনা হয় না। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ তখন স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। যুব ও ছাত্রসমাজ এবং আওয়ামী লীগেরও কেউ কেউ চাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু যেন রেসকোর্স ময়দানেই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। অন্যদিকে পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেওয়া হয়– স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সাথে সাথে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে। এমনকি সেনানিবাস থেকে জনসভা লক্ষ্য করে কামান বসানো হয়েছিল। এমন জটিল পরিস্থিতিতে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নেতা তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতা যেমন ঘোষণা করেননি, আবার তেমনি স্বাধীনতা ঘোষণার কিছু বাকিও রাখেননি। পাকিস্তানি কামান-বন্দুক, ট্যাংক, মেশিনগানের হুমকির মুখে বঙ্গশার্দূল শেখ মুজিব ওইদিন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার না-ও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

কি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সেই ইতিহাস বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন? ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৩টি মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি (৩০০+১৩=৩১৩)। এর মধ্যে অবিভক্ত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল– পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা ছিল ১৬৯টি (১৬২+৭=১৬৯)। ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। ওই নির্বাচনে বহু রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। সামরিক আইনের অধীনে ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পাওয়ার পর বাকি ২টি আসন পায় পিডিপি।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু জাতীয় পরিষদে নয়, প্রাদেশিক পরিষদেও একচেটিয়াভাবে বিজয় অর্জন করে। ওই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮টি আসন। এ এক অবিশ্বাস্য স্মরণীয় বিজয়। '৭০-এর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৮ জন ভোটার শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর তৎকালীন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান '৭১-এর ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি নেতা জেড এ ভুট্টো এবং পাকিস্তান সামরিক চক্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন সামরিক প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খান। '৭১-এর পহেলা মার্চ ১টা ৫ মিনিটে আকস্মিক এক বেতার ঘোষণায় ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান)। বেতারের ঘোষণা শুনে রাস্তায় নেমে আসেন লাখো মানুষ। সেসময় ঢাকায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক চলছিল। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ নেতার নির্দেশের জন্য মিছিল সহকারে হোটেল পূর্বাণীতে সমবেত হন। জনতাকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রলীগের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ওই সভায় প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায়। লাল-সবুজের এই পতাকায় হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল। স্বাধীনতার পর জাতীয় পতাকায় দেশের মানচিত্র না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩ মার্চ বুধবার পল্টনে ছাত্রলীগের সভায় অনির্ধারিতভাবে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হন। ওই সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ছিল দৃশ্যমান। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা ঘোষণা করে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন পদাধিকার বলে ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। পল্টনে ছাত্রলীগের এই সভায় বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা– আমি তোমায় ভালোবাসি' গানকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করা হয়। সভায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।

পল্টনে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সভায় প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি না থাকলে– আমার সহকর্মীরা নেতৃত্ব দিবেন। তাদেরও যদি হত্যা করা হয়, যিনি জীবিত থাকবেন, তিনিই নেতৃত্ব দিবেন। যেকোনো মূল্যে আন্দোলন চালাইয়া যেতে হবে– অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধু আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ৭ই মার্চ রোববার রেসকোর্স ময়দানে তিনি পরবর্তী কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন। ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে আন্দোলন এগিয়ে চলল। সারাদেশে তখন একজন মাত্র নেতা। তিনি হচ্ছেন দেশের শতকরা ৯৮ জন মানুষের ভোটে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের সামরিক শাসন চালু থাকলেও সামরিক সরকারের কথা তখন কেউ শুনছে না। শেখ মুজিবের কথাই তখন আইন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সমগ্র বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে। সেই আন্দোলনমুখর পরিস্থিতিতে ঘনিয়ে আসলো ৭ই মার্চ। সবার দৃষ্টি ৭ই মার্চের দিকে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কী বলবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাবিয়ে তুলল পাকিস্তান সামরিক চক্রকেও। কারণ তারা বুঝে গেছে, বাংলাদেশের মানুষের ওপর তাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। দেশ পরিচালিত হচ্ছে বিরোধী দলের নেতা শেখ মুজিবের কথায়।

এই অবস্থায় ৭ই মার্চ শেখ মুজিব যদি রেসকোর্সের জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন। চিন্তিত পাকিস্তান সামরিক চক্র কৌশলের আশ্রয় নিলেন। ৭ই মার্চের একদিন আগে অর্থাৎ ৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া খান টেলিফোনে কথা বলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকারের তৎকালীন তথ্য কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের 'Witness to Surrender' গ্রন্থে এসব তথ্য রয়েছে। ৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া কী বলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে? ৭ই মার্চের পূর্ব রাতে জে. ইয়াহিয়া টেলিপ্রিন্টারে শেখ মুজিবের কাছে একটি বার্তাও প্রেরণ করেন। সালিকের গ্রন্থে রয়েছে– একজন ব্রিগেডিয়ার জে. ইয়াহিয়ার সেই বার্তা ৭ মার্চের আগের রাতে শেখ মুজিবের ৩২ নম্বরের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া তাঁর দীর্ঘ টেলিফোন আলাপে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বলার চেষ্টা করেন, 'তিনি (বঙ্গবন্ধু) যেন এমন কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন, যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় আর না থাকে।' বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রেরিত ইয়াহিয়ার বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ। মেজর সালিক ওই বার্তাটি সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। বার্তায় জে. ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেন, 'অনুগ্রহ করে কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি সহসাই ঢাকা আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের প্রতি দেওয়া আপনার প্রতিশ্রুতির পুরোপুরি মর্যাদা দেবো। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে– যা আপনাকে আপনার ছয় দফা থেকেও বেশি খুশি করবে। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না।' (সূত্র : Witness to Surrender) ৬ মার্চ টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা, টেলিপ্রিন্টারে বঙ্গবন্ধুর কাছে বার্তা প্রেরণ করেও পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না জে. ইয়াহিয়া। ৬ মার্চ এও ঘোষণা করা হলো যে, ২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

৭ই মার্চ রেসকোর্সে জনসভার বক্তব্য কী হবে– এই নিয়ে ৬ মার্চ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির দীর্ঘ বৈঠক হয়। জনসভায় বঙ্গবন্ধু কী বলবেন– এ নিয়ে বিভিন্নজন বক্তব্য রাখেন। একপক্ষের মত, বঙ্গবন্ধু যেন

জনসভায় সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। অন্য পক্ষ স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণা পরিহার করে আলোচনার পথ খোলা রাখার পক্ষে মত প্রদান করেন। সভা ৭ই মার্চ সকাল পর্যন্ত মুলতুবি রইল। ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের চরমপন্থিরা বিভিন্নভাবে চাপ দিচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধুকে ৭ই মার্চের জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্যে।

পরিস্থিতির চাপে ভীত-সন্ত্রস্ত পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সদর দপ্তর থেকে বিভিন্নভাবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে এই মেসেজ দেওয়া হয় যে, ৭ই মার্চ যেন কোনোভাবেই স্বাধীনতা ঘোষণা না করা হয়। ৭ই মার্চ জনসভাকে তাক করে কামান বসানো হয়। এমনকি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত রাখা হয়। মেজর সিদ্দিক সালিক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা ৭ই মার্চের জনসভার প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ নেতাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হলে তা শক্তভাবে মোকাবেলা করা হবে। বিশ্বাসঘাতকদের (বাঙালি) হত্যার জন্য ট্যাংক, কামান, মেশিনগান সবই প্রস্তুত রাখা হবে। প্রয়োজন হলে ঢাকাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। শাসন করার জন্যে কেউ থাকবে না কিংবা শাসিত হওয়ার জন্যও কিছু থাকবে না।'

এমন এক কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ রেসকোর্সে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষকে চারটি শর্ত দিয়ে ভাষণের শেষাংশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু অংশ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, তিনি সেদিন যুদ্ধের ঘোষণা যেমন পরোক্ষভাবে প্রদান করেন– আবার যুদ্ধে কীভাবে জয়ী হতে হবে সে ব্যাপারেও বক্তব্য রাখেন। স্বাধীন দেশের সরকার প্রধানের মতো বঙ্গবন্ধু বলেন, '২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।'

প্রকৃতপক্ষে '৭১-এর পহেলা মার্চ থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের শাসন কায়েম হয়। যেজন্য তিনি বলতে পেরেছেন, ২৮ তারিখ কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। তিনি পাকিস্তানি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলারও আহ্বান জানান। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা হতে পারে। যে জন্য তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা রাস্তাঘাট সবকিছু বন্ধ করে দিও।' অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও শত্রু পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ অব্যাহত থাকে– ৭ই মার্চের ভাষণে তাই তিনি বলেছেন। তাছাড়া ভাতে মারব, পানিতে মারব– এই কথার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পর্যুদস্ত করার কথাই বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেসময় এমন ছিল যে, কোনো কোনো বিদেশি পত্রিকাও তখন জানিয়েছিল– ৭ই মার্চ শেখ মুজিব হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। '৭১-এর ৫ মার্চ লন্ডনের গার্ডিয়ান, সানডে টাইমস, দি অবজারভার এবং ৬ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ৭ই মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বাভাস দেওয়া হয়। ৬ মার্চ' ৭১ লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ছাপা হয় East Pakistan UDI (Unilateral Declaration of Independence) Expected. Sheikh Mujibur Rahman expected to declare independence tomorrow. অর্থাৎ 'শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল (৭ই মার্চ) পূর্ব পাকিস্তানের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব '৭১-এর ৭ই মার্চ সরাসরি কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, তার ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে তিনি নিজেই দিয়েছেন। ১৯৭২ এর ১৮ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে এনডব্লিউ টিভির জন্য দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৭ই মার্চের ওই কাহিনি বর্ণনা করেন। ফ্রস্ট শেখ মুজিবের কাছে জানতে চান, 'আপনার কি ইচ্ছা ছিল যে, তখন ৭ই মার্চ রেসকোর্সে আপনি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবেন?' জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি জানতাম এর পরিণতি কী হবে এবং সভায় আমি ঘোষণা করি যে এবারের সংগ্রাম মুক্তির, শৃঙ্খল মোচন এবং স্বাধীনতার।' ফ্রস্ট প্রশ্ন করেন, 'আপনি যদি বলতেন, আজ আমি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা করছি, তো কী ঘটত?' শেখ মুজিব উত্তর দেন, 'বিশেষ করে ওই দিনটিতে আমি এটা করতে চাইনি। কেননা, বিশ্বকে তাদের আমি এটা বলার সুযোগ দিতে চাইনি যে, মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং আঘাত হানা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। আমি চাইছিলাম তারাই আগে আঘাত হানুক এবং জনগণ তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।'

ইতিহাস প্রমাণ করে– ৭ই মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করে বঙ্গবন্ধু শতভাগ সঠিক কাজটিই করেছেন। ২০০৬ সালের ৩১ মার্চ আইয়ুব খান নামের একজন কলাম লেখক দৈনিক ভোরের কাগজে যথার্থই লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের একটি শব্দ বা দাড়ি-কমাতেও বাহুল্য ছিল না। প্রতিটি শব্দ বা বাক্য বাস্তবতার গভীর থেকে উৎসারিত। এ যেন কোনো দেবদূত, সমবেত জনতাকে তাদের সংকটকালে অমোঘ নিয়তির দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।' কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, বঙ্গবন্ধু যেমন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন– কালের পরিক্রমায় তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

*লেখক: '৭১-এ দাউদকান্দি মুজিববাহিনীর অধিনায়ক এবং সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক*

## কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু

মিলন সব্যসাচী

পদ্মা, মেঘনা, মধুমতি, তুরাগ, তিতাস, কুমার, কীর্তিনাশা
হাজার নদী বেষ্ঠিত জনপদের মুখরিত এই বাংলাদেশে
কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধু বীর বাঙালি জন্মেছিলেন
টুঙ্গিপাড়া গ্রামের টুকটুকে লাল কৃষ্ণচূড়া আর অবারিত
সবুজের সমারোহে সুশোভিত স্নিগ্ধ ছায়ায়।

সবুজ ঢেউ দোলানো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের কিষান
পল্লির মেঠোপথ সুনীল আকাশ বাউল বাতাস
সাধক লালনের হৃদয় নিঃসৃত সুরের একতারা
বিজয়ের বিচ্ছেদ বেদনায় সিক্ত মর্মস্পর্শী গান।
বিলে-ঝিলে, হাওড়ে-বাঁওড়ের কাকচুক্ষ জলে
সুপ্রভাতে শুভ্রতার পসরা সাজানো ফুটন্ত শতদল
ঘুম ভাঙানো দোয়েলের মিষ্টি গানের সুমধুর সুর
রূপসি বাংলার গ্রামীণচিত্র মায়ের মতো মাতৃভূমি।
নদীর বুকে পাল তোলা নায়ের রঙিন মাঝি
চিরচেনা দৃশ্যের মর্মমূল ছুঁয়ে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে
লাউয়ের ডগার মতো বেড়ে উঠেছিলেন কিশোর মুজিব।
বইচি বনের উদাস দুপুর ঘুঘু ডাকা বাবলাবন
ডাহুকের ডাকে মুগ্ধ মুখর বেতসবনের অলস প্রহর
আলপথে হেঁটে হেঁটে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া গুচ্ছগ্রাম
পথের তুচ্ছ তৃণদল, গুল্মলতা, গুবাক তরুর সারি
গোধূলির সিঁদুর-রাঙা আবির মাখা স্বপ্নীল সন্ধ্যা
জোনাক জ্বলা রাতের আকুলতা ঝিঁঝি ডাকা রাত
মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা অন্যান্য ধর্মশালার টানে
গ্রাম বাংলার সরল, সহজ মানুষের ভালোবাসায়
প্রকৃতির সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন
সম্প্রীতির নিবিড় বন্ধনে আমিত্বহীন মহা মানবের পাঠ
হৃদয়ের সবটুক ভালোবাসা দিয়ে বিশাল বুকের জমিনে
রোপণ করেছিলেন মানবিক বোধের তীর্থ-বীজ
নিপীড়িত মানুষকে ভালোবেসে নিজেকে নির্মাণ করেছিলেন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

## স্বপ্নের পতাকা

সোহরাব পাশা

বর্ণহীন কুৎসিত রাত্রি
বিলি করে দুঃস্বপ্নের বিষণ্ন পোস্টার
ভুলে যায় বিপন্ন মানুষ ভোরফোটা
রৌদ্রের কুসুম
দুপুরের গান-ভালোবাসা,

নৈঃশব্দ্যের চিত্রকল্প আঁকে
নিঃসঙ্গ-নির্জন ছেঁড়া হলুদ পা'
আদিগন্ত ঝুলে থাকে মেঘের বাদুড়;

মানুষ ভুলে যায় নিজস্ব ছায়ার প্রিয় গল্প
প্রিয় সব নামের অক্ষর
নিবিড় সম্পর্ক-দ্যুতি-ঘ্রাণ

সেই দিন-রাত্রিগুলি ছিল–শোকগাথা
বিষাদের করুণ কার্বনের নিচে
বধ্যভূমি-শহিদ মিনার।

একদিন সব রাত্রির জানালা খোলে
ভোরের তীব্র রোদ্দুর
বিপুল সুন্দর প্রফুল্ল অহংকারে
ওড়ে স্বপ্নের পতাকা,
হেসে ওঠে বিষণ্ন মানুষ
হাসে বাংলাদেশ ।

# মানুষের ডেরায় স্বপ্নের খুঁটি

সেলিনা হোসেন

ছোটো ক্যানভাসটিকে নানা রঙে ভরিয়ে তুলছে আমিনউদ্দিন। গাছের নিচে বসে আঁকা ওর প্রিয় অভ্যাস। এমন একটি অভ্যাসের ভেতরে ঢোকার দিন-তারিখের হিসাব আমিনের মনে নেই। শুধু মনে আছে যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরলে এমন একটি চিন্তা ওর ভেতরে ভোরের আলোর মতো ছড়ায়। ক্যানভাসের রঙের মধ্যে ফুটে থাকবে শহিদের মুখ। গ্রামের স্কুলে চাকরি করতে এসে এমন একটি ছায়াঘেরা জায়গা পেয়ে সিদ্ধান্তটি এমনই হয়েছিল।

ও বুকভরে বাতাস টেনে চারদিকে তাকায়। তখনো সূর্য ওঠেনি। বাতাসে শীতের মৃদু আমেজ। নিজেকেই বলে, দেখ কেমন মনোরম স্নিগ্ধতা। বড়ো করে শ্বাস টেনে এক ফুঁয়ে জীবনটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। ক্যানভাসে নীল রঙের আঁচড় টেনে বলে, মৃত্যু আমার কাছে সৌন্দর্য। এই ক্যানভাসের উজ্জ্বল রঙের মতো। জলরঙে গড়িয়ে যায় আঁকাবাঁকা রেখা। ফুটে উঠতে থাকে একটি মুখের আদল।

একদিন এ দেশে যুদ্ধ হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। আমিনউদ্দিনের বয়স তখন তিরিশের কোঠায়। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে আর মনের আনন্দে ছবি আঁকে। প্রকৃতি আর মানুষ মিলেমিশে যেন চারদিকে রং ছড়ায়। কখনো প্রকৃতির মাঝখানে বিন্দুসম মানুষ, কখনো ক্যানভাসজুড়ে শুধু একটি মুখের ওপর বিন্দুসম প্রকৃতি। এভাবে কাটছিল দিন। এক ধরনের মগ্নতা জীবনের অন্যদিক ভরিয়ে রেখেছিল। ভাবত, ঘাটতি নেই কোথাও। এমন এক গভীর সময়ে ওর সামনে তখন স্বাধীনতার ডাক। যুদ্ধ করবে বলে একদিন নদী পার হয়ে চলে গেল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। যুদ্ধ মানে তো রক্ত আর মৃত্যু। কত অসংখ্য মৃত্যু দেখতে হয়েছে। এখন সেইসব শহিদের মুখ নানা রঙে ক্যানভাসে উঠে আসে। কাউকে চিনে বা চিনে না, কেউ দৃশ্যমান, কেউ অদৃশ্য মানুষ তাতে কিছু এসে যায় না। আমিনের ক্যানভাসে শহিদের মর্যাদায় ফুটে ওঠে সব মুখ। যেসব ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখায় তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, এত মানুষের মুখ আঁকেন কেন স্যার?

আমিনউদ্দিন সোজা হয়ে বসে বুক টান করে ওদের সামনে একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি হয়ে গর্বের সঙ্গে বলে, যাদের মুখ আঁকি তাঁরা সবাই স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন।

আপনি সবাইকে চিনতেন স্যার?

শহিদদের চিনতে হয় না সোনামানিকরা। ত্রিশ লক্ষ শহিদের মুখ আমার বুকের ভেতর আছে। যাঁদের দেখিনি তাঁদেরও মুখ আঁকি। আমরাও আঁকব। আমরা যদি একটা বড়ো ফুল আঁকি সেটা কি শহিদের মুখ হবে?

পাশের জন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, ধুৎ কেমন করে হবে? ফুল কী মানুষের মুখ!

তাহলে আমি নদী আঁকব। নৌকা আঁকব। আমি একটা পাকা ধানের শিষভরা খেত আঁকব। তার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে বুলবুলির ঝাঁক।

আমি আমাদের সবার মুখ আঁকব। একটা কাগজে ছোটো ছোটো করে সব ছেলেমেয়ের মুখ।

একজন গালে আঙুল ঠেকিয়ে ভাবুকের ভঙ্গিতে বলে, এই দেশের স্বাধীনতার জন্যই তো

তাঁরা জীবন দিয়েছেন। এসব আঁকলেই শহিদদের আঁকা হবে।

ছেলেমেয়েরা নিজেরা নিজেরা কথা বলে, তখন আমিনউদ্দিন নিজের স্বপ্নের ভেতরে ডুবে যায়। স্বপ্নের ভুবন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে হেঁটে যায় ও। ওর সামনে ক্যানভাস নেই। হাতে অস্ত্র। চারপাশে ধ্বংস এবং মৃত্যু। আছে বুকের ভেতরের বড়ো ইজেলে স্বাধীনতার বিচিত্র রং। রঙের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। চোখে দেখা রঙের বাইরেও অজস্র আলোর ফুলকি ঝলকায়। হেঁটে যেতে যেতে দেখা হয় প্যাট্রিক হেনরির সঙ্গে। আমিন হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে বলে, প্যাট্রিক হেনরি আপনি?

হ্যাঁ, আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে এসেছি। স্বাধীনতার লড়াই সহজ কথা নয়। তুমি ইতিহাস ভালো করে জানো।

আমি জানি আপনি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের শাসক ছিলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশের শিকল ভাঙতে চেয়েছিলেন। সেইন্ট জর্জ চার্চের সমবেত মানুষের সামনে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, সেদিন আমি বলেছিলাম আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয়তো মৃত্যু।

আপনার এই সাহসী ভাষণ পড়ে আমি নিজেকে স্বাধীনতার যোদ্ধা ভাবতে শিখেছিলাম। আপনার ভাষণ আমাকে লড়াকু হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল।

সেজন্য আমি এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে এসেছি আমিনউদ্দিন।

আপনি বলেছিলেন জীবন কি এতই প্রিয়, আর শান্তি কি এতই মধুর যে শিকল আর দাসত্বের মূল্যে তাকে কিনতে হবে? আপনার এই লাইন পড়ে আমি বন্ধুদের বলতাম, না জীবন এত ক্ষুদ্র নয়। জীবনের সীমানা বিশাল। তাকে রক্ত আর মৃত্যু দিয়ে স্বাধীনতার গৌরবে ভরে তুলতে হয়। আপনি যেদিন ভাষণ দিয়েছিলেন সেই তারিখটি আমার মনে আছে ২৩ মার্চ, ১৭৭৫।

তোমাদের শুরুটাও মার্চ মাসে। তোমাদের জীবনে ৭ই মার্চ আছে।

ঠিক বলেছ প্রিয় বন্ধু প্যাট্রিক হেনরি। তুমি ইতিহাসের পাতায় চিরঞ্জীব থাকো।

এই মুহূর্তে আমি তোমার পাশে আছি। ছায়ার মতো আছি। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাও বন্ধু।

তখনই শত্রুর গুলি এসে বিদ্ধ হয় মিজানুরের ঘাড়ে। ও পড়ে যায়। ওহ্, কি নিদারুণ সময় ছিল সেদিন। পড়ে যাওয়া মিজানুরের শরীর টপকে ছুটে গিয়েছিল ও। প্রবল উন্মাদনায় শত্রুর মোকবেলা করেছিল। ওর বাহিনী পরাজিত করেছিল পাকিস্তানি সেনাদের। শত্রুর একজনও সেদিন জীবিত ফিরে যেতে পারেনি। অপারেশন শেষে মিজানুরের কাছে ছুটে এসেছিল ও। দেখেছিল মিজানুর তখনো কাতরাচ্ছে। জ্ঞান হারায়নি। ওকে দেখে হাত চেপে ধরে বলেছিল, তুই না বলেছিলি, আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয় মৃত্যু। আজ স্বাধীনতার জন্য আমার সামনে মৃত্যু। তুই আমার মাকে খবরটা পৌঁছে দিস। বলিস, মা যেন দুঃখ না পায়। এ মৃত্যু গৌরবের।

সবাই মিলে ধরাধরি করে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পথে মারা যায় মিজানুর।

এখনো থেমে থেমে কথা বলা মিজানুরের কণ্ঠস্বর কানে বাজে আমিনের। ও দু'হাতে মুখ ঢাকে। মাথা ঝাঁকায়। যেন দৃশ্যটি এই মুহূর্তে ওর সামনে, এই গাছতলায়। চারপাশে ভিড় করে আছে শিশুরা। আমিনউদ্দিন গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকায়। প্যাট্রিক হেনরির কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ও বলেছি না, স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অর্থ দাসত্বকে মেনে নেওয়া। আমরা তেমন জাতি নই। আমাদের সামনে যুদ্ধ। আমরা তাকে বরণ করব। মরণের বরণ ডালায় রক্তের জীবন আমিন-উদ্দিন নিজেকেই কথা বলে টের পায় ওরা আসছে। মাটিতে ওদের ছোটো পায়ের মৃদু ধ্বনি। ও মুখ থেকে হাত সরায়। দেখতে পায় কাগজ-রংতুলি নিয়ে ওরা আসছে।

স্যার আপনি মুখ ঢেকে রেখেছিলেন কেন?

আমরা দূর থেকে আপনাকে এভাবে দেখেছি।

স্যার, আপনার কি মন খারাপ?

তোদের মতো ছেলেমেয়েরা যার চারপাশে থাকে তার কি মন খারাপ হয় রে?

আমরা খুশি, আমরা খুশি।

ওরা হাসতে হাসতে গাছতলা ভরিয়ে তোলে। কাগজ বিছিয়ে নিজেরা বসে। বলে, আজ আমরা আপনার ছবি আঁকব।

কেন, আমাকে কেন?

সবার বড়ো তেরো বছরের সন্তু বলে, এটাও শহিদের মুখ হবে। শহিদের মুখের ছবি।

ও তাই, তাহলে আঁক। আমি যেভাবে বসে আছি সেভাবে বসে থাকব?

হ্যাঁ, থাকেন। আমরা কিন্তু আমাদের যেরকম খুশি সেরকম আঁকব।

আমাদের আঁকা হলে বুঝতে পারবেন আপনার মুখটা আপনার না।

তবে কার? তোদের কি মনে হয়?

সেই মুখ একজন মুক্তিযোদ্ধার।

মুক্তিযোদ্ধার! ঠিক আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ করেছে তাদের কারো না কারো মুখের সঙ্গে মিলে যাবে।

হ্যাঁ, যাবে যাবে।

ছোটোদের উৎফুল্ল কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। আমিন-উদ্দিন আনন্দে চোখ বোজে। ভাবে, এ জীবন আনন্দের এ জীবন উচ্ছ্বাসের। তাই কি? আবার ওর ভাবনায় ঢুকে যায় যুদ্ধক্ষেত্র। ওর সামনে এগিয়ে আসেন আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন ছোটো করে দেখতে নাই আমিনউদ্দিন। আপনি তো মাত্র তিন মিনিটের একটি বক্তৃতা দিয়ে ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছেন। অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। হা-হা করে হাসেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাগুলির মাঝে তাঁর হাসি অমলিন থাকে। গোলার শব্দ ম্লান করে দিয়ে সে হাসি ভরিয়ে তোলে মুক্তিযোদ্ধা আমিনের বুক। ও বলতে থাকে, ইতিহাস থেকে আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার গেটিসবার্গে মাত্র কয়েকদিনের গৃহযুদ্ধে আট হাজার লোক নিহত হয়েছিল। যুদ্ধের চার মাস পরে তাদের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল স্মৃতিসৌধ। তাঁদের স্মরণে আয়োজিত সভায় আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তা গেটিসবার্গ অ্যাডরেস নামে খ্যাত। আমি মনে করি ইতিহাস জানা খুব জরুরি। বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীনতার বিকল্প কিছু নেই। আব্রাহাম লিংকন আপনি ইতিহাসের অমর মানুষ। স্বাধীন দেশে বাস করার যে ধারণা আপনি দিয়েছেন তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনায় সোনার হরফ।

আবার হা-হা হাসিতে ভরে যায় যুদ্ধক্ষেত্র। আমিন শুনতে পায় তাঁর কণ্ঠস্বর জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার, জনগণের জন্য সরকার। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুণ আব্রাহাম লিংকন।

আমার প্রার্থনা তোমরা যেন যুদ্ধে জয়ী হতে পারো। তোমাদের স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের সরকার।

তখন সিলেটের ধলই সীমান্তে মুন্সী আব্দুর রউফ তাঁর মেশিনগান থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছেন। পাকিস্তানি সেনারা নানা কৌশলে এগিয়ে আসছে। চারদিক ঘিরে ফেলেছে। মুন্সী রউফ অন্যদের বলছে, আমি গুলি চালিয়ে শয়তানদের দমিয়ে রাখছি। তোমরা পিছু হটে যাও। অন্যরা পিছু হটে যায়। মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করে, কিন্তু একসময় ওদের গোলা এসে পড়ে মুন্সী রউফের ওপর। শহিদ হন তিনি। সেজন্যই নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের কোনো সহজ পথ নেই। স্বাধীনতার দাবি রক্ত আর মৃত্যু। সে জীবন দেয় আপামর জনসাধারণ।

আমিনউদ্দিন চোখ খুললে দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমিন সোজা হয়ে বসে।

একজন ডাকে, স্যার।

আমিনউদ্দিন ওর দিকে তাকায়। ও চিন্তা করতে চায় যে ও কতদিন ধরে এই ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখাচ্ছে। গত পনেরো বছরে অনেকে আঁকা শিখেছে। বড়ো হয়েছে। চলে গেছে অন্য কোথাও। কাজের খোঁজে শহরে গিয়েছে, কিংবা বিদেশে। কারো বিয়ে হয়ে চলে গেছে অন্য গ্রামে। বাবার বাড়িতে এলে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বলে, আমাদের গাঁয়ে আপনার মতো স্যার নাই। থাকলে আমার ছেলেটাকে ছবি আঁকা শেখাতাম স্যার। ছোটোবেলায় আপনার কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলাম বলে আমি অনেক কিছু সুন্দর করে করতে পারি। আমিন ওদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা শুনিয়েছে। এখন ওর সামনে একদল ছেলেমেয়ে। এখন ওর সামনে সময় ১৮৬৩ সালের নয়। যখন আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমেরিকা মহাদেশ গড়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা ও জনগণের জীবনমানের সমতা। এই লক্ষ্য নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিল। গৃহযুদ্ধে আমাদের শত শত মানুষ জীবন দিয়েছিল। মানুষই একটি দেশের শক্তি। তাদেরকে পূর্ণ জীবনের অধিকার দিতে হবে।

স্যার, আপনি দেখবেন না আপনাকে কীভাবে এঁকেছি?

হ্যাঁ, দেখব তো। দাও।

ওরা একটা একটা করে ওর সামনে কাগজ দিয়ে যায়। কাগজগুলো গুছিয়ে আমিন বলে, আজ তোমাদের ছুটি।

কাল আমাদের স্কুল আছে। আপনি কি ক্লাসে স্বাধীনতার কথা পড়াবেন স্যার? আপনি কত সুন্দর করে শহিদদের কথা বলেন। আমরা সেইসব গল্প নিয়ে যাই অনেকের কাছে।

নিয়ে যাও অনেকের কাছে?

হ্যাঁ স্যার, তাই তো করি। বাড়ি গিয়ে মাকে বলি সবার আগে। তারপরে অন্যদেরকে বলি।

> তিনি বলেছিলেন, আমাদের মায়েরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়েছেন। তাঁদের চোখে জল নেই। আগুন আছে। তোমরা এই আগুন নিয়ে লড়াইয়ের মাঝে বীর যোদ্ধা। আমাদের মেয়েরা বীর যোদ্ধা। যুদ্ধ সবার।

ঠিক আছে আগামীকাল তোমাদেরকে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের গল্প শোনাব। সেইসঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলার। তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতা লাভ কঠিন। কোনো সহজ পথে স্বাধীনতা হয় না।

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বলে, কোনো সহজ পথে স্বাধীনতা হয় না।

এই কথাটা বলতে বলতে তোমরা বাড়ি চলে যাও।

যদি আমরা গানের সুরের মতো টেনে টেনে বলি?

বলো, সে তো আরও ভালো।

ওরা চলে যেতে থাকে। দুজন ফিরে এসে বলে, আপনি বাড়ি যাবেন না স্যার?

তোমরা যাও। আমি একটু পরেই যাব।

পরক্ষণে ভাবে, ওদেরকে বাড়ি যেতে বলা সহজ। নিজেকে বলা সহজ নয়। কখনো ঘর ওকে টানেনি। নিঃসঙ্গতার বোঝা বুকের মধ্যে পর্বত সমান। বেঁচে থাকার আনন্দ-বেদনা যুদ্ধদিনের স্মৃতি। যুদ্ধক্ষেত্র, শত্রুর পরাজয়, আহতদের আর্তনাদ, শহিদের...। এখানে ঘর নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘর থাকে না, ঘরের স্বপ্ন থাকে। আমিন-উদ্দিন ওদের চলে যাওয়া দেখে। ওরা নিজ নিজ ঘরে যাচ্ছে। ঘরে বাবা-মা-ভাইবোন আছে। তারা ভালোবাসার মানুষ। ভালোবাসার মানুষ ছাড়া ঘর হয় না। সেই অর্থে ও আসলে একজন ঘরহীন মানুষ। ওর মাথার ওপরে শুধু ছাদ আছে, বিছানা আছে, খাবার আছে। আর কিছু নাই। ঘরের মানুষ নাই, ভালোবাসা নাই। তারপরও ছাদের নিচে ফিরতে হয়। বেঁচে থাকার এটাই নিয়ম।

ওরা চলে গেলে আমিনউদ্দিন নিজের ক্যানভাসের দিকে তাকায়। ওখানে কি সোহেলির মুখটা ফুটে ওঠে কখনো? যাকে ও স্বাধীনতার পরে কামালপুরের বাঙ্কার থেকে উদ্ধার করেছিল। মেঘালয়ের সীমান্ত বর্ডারে বিধ্বস্ত সোহেলি ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কোথায় যাব? অমিনউদ্দিন বলেছিল, আপনার বাড়িতে। উদ্‌ভ্রান্ত সোহেলি বলেছিল, মৃত্যু কি খুব কঠিন? আপনার রাইফেলে গুলি আছে? আমিন চুপ করে থাকলে সোহেলি আবার বলেছিল, একটি গুলি খরচ করুন আমার জন্য। আমি তো জানি আমার বাড়ি নেই, দেশও নেই। আমি কোথাও যাব না।

আমিন গম্ভীর স্বরে বলেছিল, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।

আপনার বাড়িতে? কে আছে?

বাবা-মা-ভাইবোন সবাই আছে। আমি বিয়ে করিনি।

তারা আমাকে মানবে?

মানবে না। আমি মানাব। আমি আপনাকে ভালোবাসা দেবো। আপনি তো দেশের জন্য নিজের সবকিছুই দিয়েছেন।

আপনিও যুদ্ধ করেছেন। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য আপনার নিজের কোনো দায় নেই। দায় এই জাতির।

সেদিন প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সোহেলি। আমিনের খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওকে গভীর মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু চারপাশে লোক জমে যাওয়ায় সে কাজটি করা হয়নি। একজন ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করে

তার জিপে সোহেলিকে নিয়ে এসেছিল ময়মনসিংহে। ও কিছুতেই ওর বাড়ির ঠিকানা বলেনি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ওকে রাখা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে ও পালিয়ে গিয়েছিল। পরদিন ওর লাশ পওয়া গিয়েছিল ব্রহ্মপুত্র নদে।

এখনো সোহেলির মুখ ওর ক্যানভাসের একটি বড়ো জায়গা। ও মনে করে সোহেলি শহিদ। স্বাধীনতার জন্য যা দেবার তার সবটুকু দিয়েছে। কিছুই বাদ রাখেনি ও। সোহেলির মৃত্যু আমিনের ক্যানভাসে মৃত্যুর সৌন্দর্য।

সেই দুপুরে ঘরে ফিরে ওর খুব মন খারাপ থাকে। কোনো কাজে মন বসে না। সোহেলিকে মনে রেখে ওর আর বিয়ে করা হয়নি। কাউকে ভালোবাসতেও মন চায়নি। ষাট বছরের নিঃসঙ্গ জীবন কেটেছে স্কুলে পড়িয়ে, ছবি এঁকে, ছেলেমেয়েদের ভালোবেসে। অনেক রাতে ক্যানভাসের সামনে বসলে ফুটে উঠতে থাকে ভিন্ন ছবি। যেন ক্যানভাসটি মিছিলের নগরী। হাজার হাজার মানুষ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত নিয়ে এগিয়ে আসছে। বর্ণবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ আমেরিকার কৃষ্ণ-মানুষেরা। কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনে উদ্‌বুদ্ধ করছেন সাধারণ মানুষকে। বলছেন, আই হ্যাভ আ ড্রিম...। বব ডিলান আর জন বয়েজের বিপ্লবী গানের সুরে উত্তাল জনসমুদ্র। সময় ১৯৬৩। দিন ২৮ আগস্ট। তিনি বলেছিলেন, জনগণের অধিকার অর্জনের কথা। বলেছিলেন, আমি স্বপ্ন দেখি জন্মসূত্রে সব মানুষ সমান। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে হয়। সাদা আর কালো দিয়ে বৈষম্য করা অন্যায়। ক্যানভাস থেকে মাথা তুললে আমিনের মনে হয় ঘরজুড়ে আলো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মার্টিন লুথার কিং। দু চোখে বিস্ময় ছড়িয়ে আমিনউদ্দিন বলে, আপনি?

তোমাকে দেখতে এসেছি শিল্পী। বাঙ্কার থেকে উঠে আসা মেয়েটিকে ভালোবাসা দিয়ে মানবতার ঘাটতিকে জয় করেছ শিল্পী। জানোই তো ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের কোনো সহজ পথ নেই।

সোহেলিকে স্বাধীনতা অর্জনের কঠিন পথে যেতে হয়েছিল মিস্টার মার্টিন।

হ্যাঁ, হয়েছিল। আমি জানি। যুদ্ধের এটাই নিয়ম।

কৃষ্ণ মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আপনাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এটা মৃত্যুর সৌন্দর্য।

মার্টিন লুথার কিং মৃদু হেসে বলেন, তুমি ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলছ এটি অনেক বড়ো কাজ। ওদেরকে অনবরত বলে যেতে হবে স্বাধীনতার কথা।

আমি ইতিহাসের কথা বলতে ভালোবাসি।

ঘরের আলো নিভে যায়। ও বুঝতে পারে লোডশেডিং। ঘরে কেউ কোথাও নেই। ক্যানভাসজুড়ে আঁকা হয়েছে একজন মানুষের রক্তাক্ত শরীর। তিনি কি অব্রাহাম লিংকন নাকি মার্টিন লুথার কিং নাকি বঙ্গবন্ধু? আমিনউদ্দিন চার্জার লাইট জ্বালিয়ে ঘরের আলো ফিরিয়ে আনে। ও জানে আজ ৭ই মার্চ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনের রেসকোর্স ময়দান ছিল লোকে লোকারণ্য। একদিকে বঙ্গবন্ধুর জলদ গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসছে উদ্দীপিত ভাষণ, অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার মাথার ওপর ওড়াচ্ছে হেলিকপ্টার। আমিনের মনে হচ্ছিল সব মানুষের সঙ্গে ও হেঁটে যাচ্ছিল দিগন্তের পথে। কোথাও কোনো বাধা ছিল না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্বপ্নের পথে হেঁটে যাচ্ছিলেন শেখ মুজিব। আবার সেই যুদ্ধক্ষেত্র আবার সেই রক্ত আর মৃত্যুর দেশ। শেখ মুজিব বলছেন, আমরা পিছু তাকাব না সোনার মানুষেরা। যেতে হবে অনেক দূর। ও বলেছিল, বঙ্গবন্ধু আমি আমিন। মায়ের এক ছেলে। মাকে একা রেখে যুদ্ধ করতে এসেছি। তিনি বলেছিলেন, আমাদের মায়েরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়েছেন। তাঁদের চোখে জল নেই। আগুন আছে। তোমরা এই আগুন নিয়ে লড়াইয়ের মাঝে বীর যোদ্ধা। আমাদের মেয়েরা বীর যোদ্ধা। যুদ্ধ সবার।

হ্যাঁ, যুদ্ধ সবার। সোহেলি তোমার হাত ধরে আমি হেঁটে যাই যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি বলব না, আই হ্যাভ অ্যা ড্রিম। আমরা বলব, উই হ্যাভ অ্যা ড্রিম। স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন সোহেলি। আমি এখনো স্বপ্ন দেখি। ছেলেমেয়েদের বলি, স্বাধীনতা মানে মৃত্যুর অমর গান। শহিদের মৃত্যু নেই। বঙ্গবন্ধু বলতেন, বাংলার দুঃখী মানুষকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। ওরা আমাকে মারবে না। কিন্তু ওরাই তাঁকে মেরেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

সে রাতে ঘরে আর বিজলি বাতি জ্বলল না। আমিন আঁকাজোকা বন্ধ রেখে আলমারির ড্রয়ার থেকে যত্ন করে রাখা চিঠিটি বের করে। মাত্র তিনটি লাইন লিখেছিল সোহেলি: প্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, আমি যাচ্ছি। আপনার হৃদয়ের সবটুকু আমি পেয়েছি। স্বাধীনতার এই ভালোবাসা নিয়ে আমি আর দু চোখ ভরে এই দেশটা দেখব না। ইতি সোহেলি। চিঠিটি বুকের ওপর রেখে শুয়ে থাকে আমিন। ঘুম আসে না। দু চোখ ভরে অন্ধকার ভালোবাসার প্রগাঢ় অনুভূতি দেয়। এই মুহূর্তে অন্ধকার ওর কাছে আলোর চেয়ে বেশি। ওর মনে হয় বঙ্গবন্ধু এই ঘরেই আছেন। বুকে গুলি নিয়ে মানুষের স্বপ্নের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। কোথাও যাননি। ক্যানভাসে ফুটে আছেন।

পরদিন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডের ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে অধিনায়ক যখন নিজেদের বিজয়কে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসর্গ করে তখন আমিনের মনে হয় ও সোহেলির হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা এখন অস্ট্রেলিয়ার পথে। আমিন সোহেলিকে বলছে, দেখো ওরা বাংলাদেশকে কোথায় উঠিয়েছে। একদম আকাশের কাছাকাছি। তোমার আমার যুদ্ধটা এরকমই ছিল সোহেলি। আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে একটি দেশ যুক্ত করেছি। ওরা আমাদেরকে মনে করছে। তোমার-আমার যুদ্ধকে। চলো ওদের খেলার মাঠ থেকে ঘুরে আসি। মুক্তিযোদ্ধা সোহেলি তোমার হাতটা বাড়াও। আমি ধরি।

আমিনউদ্দিনের কানে ভেসে আসে উল্লাসধ্বনি। ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে দৌড়াচ্ছে। দু চোখ ভরে ওদের আনন্দ উপভোগ করে ও। নিজের দ হাত বুকের ওপর চেপে রাখে। শুনতে পায় বিশ্ব নেতাদের কণ্ঠস্বর। সবাই মিলে বলছেন, উই হ্যাভ অ্যা ড্রিম ...। আমিনের দু চোখ জলে ভরে যায়। বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসা সোহেলি ওর সামনে। চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে বিজয়ের ধ্বনি। ওর ক্যানভাসে বিমূর্ত একাত্তর।

*লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক*

# জাতীয় শিশুদিবস ও বঙ্গবন্ধুর শিশু আইনের ধারাবাহিকতা

রফিকুর রশীদ

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল শিশুর মতো সরল প্রাণ, শিশুর মতো আবেগ ভরা সহজ হৃদয়। শিশুদের তিনি ভালোবাসতেন বুকের মমতা দিয়ে, নিবিড়ভাবে। রাষ্ট্রনায়ক হবার পরও একটুখানি সময়-সুযোগ পেলেই তিনি শিশুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন, অপার আনন্দ পেতেন, নতুন কাজের উদ্দীপনা লাভ করতেন। শিশুসঙ্গ ছিল তাঁর কাছে অফুরন্ত প্রেরণার উৎসভূমি। ফুলের মতো ফুটে থাকা বিচিত্র সব শিশুমুখের দিকে তাকিয়ে এই মহান নেতা বাংলার ভবিষ্যৎ দেখতেন। তিনি প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন– আজকের শিশুই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, চিন্তাবিদ। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক শিশুর ভেতরেই আছে অপরিমেয় সম্ভাবনা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করা এবং সেটা করা উচিত রাষ্ট্রের স্বার্থেই। এই সব বিকশিত প্রতিভার গৌরবে গর্বিত হবে রাষ্ট্র, তাদের সেবায় অবদানে ধন্য হবে রাষ্ট্র। কাজেই রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে শিশুবান্ধব এবং প্রতিভা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে। শিশু অধিকার রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকেই যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

হাজার বছরের শোষিত, বঞ্চিত বাঙালি জাতির বুকের গভীরে লালিত স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ মুকুলিত শুধু নয়, প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। তাঁরই হাত ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। পরিত্যক্ত বাড়িঘর অগ্নিদগ্ধ। অনাবাদি ফসলের মাঠ। দীর্ঘ নয় মাস পরে এরই মাঝে এলো স্বাধীনতা। মানুষের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই। কোথায় চিকিৎসা! কোথায় বা শিক্ষা! সব কিছু ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশে। তবু স্বাধীনতা এসেছে অবশেষে। যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিণতিতে যেকোনো বিবেকবান মানুষই স্তম্ভিত এবং আতঙ্কিত না হয়ে পারে না। মানবেতর এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে শিশুরা টিকে থাকবে কেমন করে! আর শিশুরাই যদি অপুষ্টির শিকার হয়, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে, অসুস্থ থাকে তাহলে সেই জাতি উঠে দাঁড়াবে কার ভরসায়? সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলাই চলে। বাংলাদেশের বিজয় লাভের পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশের মাটিতে পা রাখতেই বঙ্গবন্ধু আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কান্নায় ভেঙে পড়েন। চারপাশে তাকিয়ে তিনি চমকে ওঠেন– এই কি তাঁর সোনার বাংলা! তাঁর দু চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে।

গোটা জাতি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে জাতির পিতার মুখের দিকে। প্রবল আত্মবিশ্বাস আর সাহসিকতার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন দেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। পুরানো ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ যেন আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, দুহাতে জঞ্জাল সরিয়ে স্বাধীন এই ভূখণ্ডকে যেন শিশুর নিরাপদ বাসস্থানে পরিণত করা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সরকার। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান। সেখানে মর্যাদার সাথে ঘোষিত হয় শিশু অধিকারের কথা। বাংলাদেশের নতুন সংবিধানের ২৮(৪) ধারায় শিশুর উন্নয়ন ও তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার কথা যথাযথভাবে স্থান দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিক আগ্রহ এবং উৎসাহের কারণে ১৯৭৪ সালে এই দেশে প্রণয়ন করা হয় জাতীয় শিশু আইন। স্মরণ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশে এই আইনটি যখন প্রণয়ন ও পাশ হচ্ছে, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ তখনো অনুমোদিত হয়নি। সেটি হয় ১৯৮৯ সালে। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯০ সালে

বাংলাদেশ সেই আন্তর্জাতিক সনদেও স্বাক্ষর করে। বরং একটু গর্বের সঙ্গেই বলা যায় জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। মজার ঘটনা হচ্ছে, জাতিসংঘ অনুমোদিত এই আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশের শিশু আইনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শিশু অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন অধিকতর আধুনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

বঙ্গবন্ধু প্রণীত বাংলাদেশের শিশু আইনের নেপথ্যে যেমন আছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপর্যস্ত প্রেক্ষাপট, জাতিসংঘ অনুমোদিত শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন ও প্রস্তুতির পেছনেও তেমনি রয়েছে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিশপ্ত প্রেক্ষাপট। যুদ্ধ থেমে গেলেও তার তাণ্ডব চিহ্ন রয়ে যায়। সে চিহ্ন বেশি করে বয়ে চলে শিশুরা। মা-বাবা হারিয়ে কেউ এতিম হয়েছে, হাত-পা হারিয়ে কেউবা পঙ্গু, বারুদের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ অনেক শিশু। শিশুরাই যদি ভবিষ্যৎ হয়, তাহলে এই সব বিপন্ন মানব শিশুকে বাঁচাতে হবে, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিতে হবে। মহৎ এই ভাবনা থেকেই এগিয়ে আসে বিশ্ববিবেক। ১৯৫২ সালে 'শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন'-এর উদ্যোগে বিশ্ব শিশুদিবস পালনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও ১৯৫৩ সালের ৫ অক্টোবর বিশ্বের ৪০টি দেশে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার ঘোষণা গৃহীত হয় এবং সারা বিশ্বে দিবসটি পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ইউনিসেফকে। তারই ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশও। সার্কভুক্ত দেশগুলো ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দশকটিকে 'সার্ক কন্যাশিশু দশক' হিসেবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, এর ফলে কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সম্প্রতি যোগ হয়েছে অটিজম বা প্রতিবন্ধী শিশুদের মানবিক বিকাশে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ।

সুখের কথা, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সামাজিক আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু যে শিশু আইন উপহার দিয়ে যান, পরবর্তীতে তারই আলোকে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ তে শিশুর সার্বিক দিক বিবেচনায় এনে শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের কথা বলা হয়েছে। এই শিশুনীতিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া প্রতিরোধসহ ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

সেই ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিশু আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রতি মনোযোগ ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, শিশুদের আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা ভাবনার পাশাপাশি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য উন্মুক্ত করে দেন শিক্ষার দুয়ার। অবৈতনিক শিক্ষার সাথে সাথে বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রাপ্তির নিশ্চয়তা মূলত এ উদ্যোগে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার আবারও দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয়করণ করেন, বছরের শুরুতেই মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার ও আধুনিক ই-মেইল প্রযুক্তি।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশই শিশু। কাজেই শিশুর ভবিষ্যৎ মানেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। মনে রাখতে হবে– আহার বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনে বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করাও সকল শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পী মন থাকে। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে শিশুকে যুক্ত করার পাশাপাশি তার অন্তরের গভীরে সুপ্ত কোমল সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে তবেই হবে শিশুর সুষম বিকাশ। অবশ্য এজন্য শুধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না, পারিবারিক পরিচর্যা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যোগ্য নাগরিক গড়ে উঠবে বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে থেকে। এরাই গড়ে তুলবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। শিশুদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন বলেই বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে কচিকাঁচার আসর, খেলাঘর প্রভৃতি শিশু সংগঠনের শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতেন, শিশুদের চোখের গভীরে দেখতেন বাংলার ভবিষ্যৎ। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। এ দেশের শিশুদের নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। সবাই মিলে এই রাষ্ট্রকেই করে তুলতে হবে শিশুবান্ধব রাষ্ট্র। তবেই হবে জাতীয় শিশুদিবস পালনের সার্থকতা।

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বছরে একাধিকবার শিশুদিবস পালন করা হয়। এর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একান্ত নিজেদের মতো করেও পালন করে শিশুদিবস। বাংলাদেশে জাতীয় শিশুদিবস পালিত হয় ১৭ মার্চ, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে। এরকম ভাবে শিশুদিবস নির্ধারনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই আছে।

আন্তর্জাতিকভাবে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাতীয়ভাবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিবসকে শিশুদিবস হিসেবে পালন করে থাকে। প্রতি বছর জুনের দ্বিতীয় রবিবার আমেরিকায়, ১ জুলাই পাকিস্তানে, ৪ এপ্রিল চীনে, ব্রিটেনে ৩০ আগস্ট, জাপানে ৫ মে, জার্মানিতে ২০ সেপ্টেম্বর, ভারতে ১৪ নভেম্বর (প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন) এবং এরকম আরও বিভিন্ন দিন বিভিন্ন দেশে জাতীয় শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয়। তবে সব দেশেই শিশু দিবস পালনের উদ্দেশ্য একটাই... দেশের শিশুদের অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বার্তা দেওয়া । বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব শিশুদিবস পালন করা হলেও জাতীয় শিশুদিবস ছিল না। এই অভাব পূরণে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই সরকারের মন্ত্রিসভা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশুদিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়। এ দিনটি সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। বঙ্গবন্ধু নিজে কখনো নিজের জন্মদিন পালন করতে পছন্দ করতেন না। জন্মের এই দিনটিতে শিশুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে আনন্দ করে কাটাতে ভালোবাসতেন। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চকে জাতীয় শিশুদিবসের মর্যাদাদান মূলত শিশুদরদি জাতির পিতার প্রতি গোটা জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন বলে গণ্য করা যায়। এই দেশকে শিশুবান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তবেই এই শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ণতা পাবে, জাতীয় শিশুদিবস পালনও সার্থক হবে।

*লেখক: কথাসাহিত্যিক*

# স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ বেতার

কাওসার চৌধুরী

## এক.

'বেতার' শব্দটি আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'ই প্রকৃতপক্ষে 'রেডিও' এবং 'পাকিস্তান' শব্দ দুটি থেকে আমাদের পৃথক করে দিলো স্পষ্টভাবে। ঐতিহাসিক ওই ঘটনাটির আগে সেই প্রচার মাধ্যমটির নাম ছিল 'রেডিও পাকিস্তান'। একাত্তরের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ফলে এ দেশের সবকিছু থেকে পাকিস্তান শব্দটি বিলুপ্ত হতে থাকে অবধারিতভাবে। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' এবং পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশ বেতার' তারই ধারাবাহিকতার সোনালি ফসল।

কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী– একাত্তরে, এদশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের সাথে নিয়ে আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে নির্মমভাবে! বাংলাদেশের ১ কোটি নিরীহ মানুষকে মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। বাঙালিদের অসংখ্য বাড়িঘর তারা পুড়িয়ে দেয়, ধনসম্পদ লুট করে। সনাতন ধর্মাবলম্বী অনেক মানুষকে তারা ধর্মান্তরে বাধ্য করে। সেই সময়ে পাকিস্তানি এবং তাদের দোসররা যুদ্ধাপরাধ করেছে, অনেক মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। এগুলো পরবর্তী সময়ে আইনের কাছে সন্দেহাতীতভাবে জঘন্য অপরাধ বলে প্রমাণিত হওয়ায় 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' তাদের কজন নেতাকে শাস্তি প্রদান করেছে এবং সেই শাস্তি কার্যকরও হয়েছে।

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন; পাকিস্তানিদের সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ এবং তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিষয়গুলো 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' যুদ্ধের নয় মাসে সততার সাথে প্রচার করেছে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই ঘটনাগুলো 'বাংলাদেশ বেতার' তার শ্রোতাদের কাছে প্রচার করেছে- দক্ষতা, সততা এবং বস্তুনিষ্ঠতার সাথে। বেতারের এই ভূমিকা অনন্য, অবিস্মরণীয়। ভুলে গেলে চলবে না, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'– মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছে নিজস্ব মাধ্যমে। লড়াই করেছে তার অনুষ্ঠানমালা দিয়ে। অবরুদ্ধ দেশবাসী, এক কোটি শরণার্থী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি-সাহস আর প্রেরণা জুগিয়েছে অবিরাম। প্রবাসী সরকারের খবর আর নির্দেশনা প্রচার করে এই বেতার কেন্দ্র ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। দেশমাতৃকাকে দখলদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে গিয়ে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' যে বৈপ্লবিক এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এবং (স্বাধীনতা পরবর্তী) তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ

বেতার যে গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছে- তা প্রশংসনীয়। জয়তু 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'- জয়তু 'বাংলাদেশ বেতার'।

দুই.
একটি পর্যবেক্ষণ:
শ্রোতাকে আলোড়িত করার ক্ষেত্রে বেতার- পৃথিবী নামের এই উপগ্রহে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুদূর প্রসারী ক্ষমতার একটি গণমাধ্যম! এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরেকটু খোলাসা হতে পারে। ধরুন, আমরা যারা 'ভিজুয়াল মিডিয়ামে' কাজ করি টেলিভিশন কিংবা বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করার মাধ্যমে; তারা কিন্তু প্রতিটি 'শট' দিয়ে একেক জন দর্শক-শ্রোতাকে সুনির্দিষ্ট একটি 'দৃষ্টিভঙ্গি'তে আটকে দিই! দর্শকের ভাবনাটি আমাদের শট দ্বারা ভীষণভাবে 'নিয়ন্ত্রিত' হয়ে পড়ে! পক্ষান্তরে বেতার কিন্তু একজন শ্রোতাকে একটি শব্দ কিংবা একটি বাক্য দিয়ে এই মহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারে- 'ন্যানো সেকেণ্ডের' মধ্যেই!

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক এই প্রসঙ্গে। ধরা যাক, বেতারে একটি গান প্রচারিত হচ্ছে- 'তন্দ্রাহারা নয়ন আমার এই মাধবী রাতে...।' এই গান থেকে একজন শ্রোতা- তার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে গানের প্রতিটি বাণীর সাথে ইচ্ছেমতো ভ্রমণ করতে পারেন এই ব্রহ্মাণ্ডের যেকোন স্থানে, যেকোন বিষয়ে, যেকোন রূপ নিয়ে। আস্বাদন করতে পারেন পছন্দসই 'রস'। শ্রোতা যেই শ্রেণি-পেশা কিংবা যেই উচ্চতার মানুষই হোন না কেন- তাঁর অভিজ্ঞতা এবং কল্পনাশক্তি তাঁকে এই ভ্রমণের সুযোগ করে দেবে, জাগিয়ে তুলবে তার ভেতরকার আমিকে।

বেতারে শুধু গান কেন- নাটক, কথিকা, খবর কিংবা যেকান আলোচনা অনুষ্ঠানই শ্রোতাকে স্বাধীনতা দেয় চিন্তা এবং অনুভবের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিভ্রমণের। আমার আজও মনে পড়ে বেতারে প্রচারিত 'কৃষি বিষয়ক' একটি অনুষ্ঠানের পরিচিতি সুর আর গানের কথা 'ও বা'জান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে/ গরুর কাঁধে লাঙ্গল দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে...।' গানটির এই একটিমাত্র লাইনই এক লহমায় আমাকে নিয়ে যায় গ্রামের মাঠে, কৃষকের কাছে, উৎপাদনের মূল যজ্ঞে! আমি ফিরে যাই আমার দুরন্ত শৈশবে; আমার জন্মস্থানের যাপিত জীবনে। বিষয়টি নিয়ে আমার অনুভূতি আর ভাবনাগুলো আবর্তিত হতো একেবারে আমার মতো করেই, আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে! বেতারের এই এক মহাশক্তি। আমি বেতারের অনুরাগী!

তিন.
একটি গান, একটি প্রলয়:
একটি ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য কাহিনি দিয়ে আমার এই লেখাটি সমাপ্ত করতে চাই। ১৯৭৮ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত (মাঝখানে কিছু সময় বাদে) আমি ঢাকার 'আলিয়ঁস ফ্রসে'তে (ফরাসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র) নিয়মিত আড্ডা দিয়েছি। মহামারি 'করোনা' শুরু হওয়ার পরে আলিয়ঁস তার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনায় এখন আর যাওয়া হয় না ওখানে।

করোনার আগে একদিন; সন্ধ্যা থেকে আড্ডা দিয়ে রাত ৯টায়- ধানমন্ডির আলিয়ঁস থেকে বেরিয়েই দেখি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে। একটি রিকশা ডেকে আমি চটজলদি উঠে পড়ি লালমাটিয়ার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ হইহই করে দৌড়ে এসে আমার পাশে রিকশায় উঠে পড়ল আমাদের আড্ডার এক সাথি অনুজপ্রতীম বন্ধু সাইদুর (সাইদুর রহমান)। বছর ৪/৫ আগে সাইদুর প্রয়াত হয়েছেন হঠাৎ করেই! আমি তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। সাইদুর থাকত মোহাম্মদপুরে। প্রায়ই সে আমার সাথেই যাতায়াত করত একই পথের পথিক হওয়ার কারণে। সে রাতেও একই উদ্দেশ্যে সাইদুর রিকশায় উঠে বসে।
ঢাকার রিকশার ঘোমটাগুলো (হুড) আবার আমার 'শারীরিক উচ্চতার' সাথে যায় না! আমার মাথাটা লেগে যায় হুডের মাথায়। ফলে নিজের মাথাটা একটু কাত করে রাখতে হয় সারা পথ জুড়েই। সে এক যন্ত্রণার সময় বটে! সে রাতে সাইদুর আমার পাশে থাকায়– খুব আয়েশে আমার মাথাটা তার কাঁধে রেখে মনের সুখে গান ধরি নিচু গলায়।

সাইদুর বাঁ হাতে রিকশার পর্দায় একটি পাশ ধরে আছে, আর আমি ডান হাত দিয়ে পর্দার অন্যপ্রান্তটি ধরে রেখে বৃষ্টির ছটা থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করছি। রিকশা চলছে ধীর গতিতে। বৃষ্টির কারণে রাস্তায় অন্য যানবাহন কম থাকলেও রিকশা চালককে বলি– একটু ধীরে চালাতে। 'সাবধানের মার নেই'– কথাটি অন্য কোনো সময়ে মনে না থাকলেও রাস্তায় কেন জানি খুব মনে পড়ে! জানি না, শেষ দিন, শেষ পর্যন্ত, শেষ রক্ষা হবে কিনা!

বৃষ্টি দেখে আমি গাইছিলাম 'আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে...।' কিছুক্ষণ গাওয়ার পরে দেখি- সাইদুর এই ঠাসাঠাসির মধ্যেও তার জিনস-প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা নোট বার করল কষ্ট করে। তার মধ্য থেকে একটা বিশ টাকার নোট আমার দিকে এগিয়ে দেয়। আমি মহা আনন্দে টাকাটা নিয়ে বলি– অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বাহ, আমার গান তোমার এত ভালো লেগেছে বুঝতে পারিনি। সাইদুর বললো- 'জি না, টেকাডা দিলাম গান বন্ধ করণের লাইগা! আপনার হেড়ে গলার বেসুরো গানে আমার কানের পোকা বাইর হইয়া যাইতেছে! টেকাডা লইয়া দয়া কইরা গান থামান! আর সহ্য হইতেসে না!'

আমি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠি! বলি– সাইদুর, তোমার এত বড়ো সাহস! আমি রিকশা ভাড়া দিয়া তোমারে বাসায় পৌঁছায়া দিতাসি, আর তুমি কিনা আমারে টেকা দেও গান থামানোর লাইগা! তুমি অহনই নামো রিকশা থেইকা। তোমারে আমি নিমু না আমার লগে! তুমি জাহান্নামে যাও...! সাইদুর হাসতে হাসতে কাঁচুমাচু হয়ে বলে– অহন এই বৃষ্টির মইধ্যে কই যামু কাওসার ভাই; রিকশা পামু কই! ঠিক আছে, আইজ না হয় রিকশা ভাড়াটা আমিই দিমুনে। তবু বৃষ্টির ভেতরে আমারে আর নামাইয়েন না কইলাম! এরপরে আমাদের সম্মিলিত হাসিতে যোগ দেয় রিকশা চালকও। বৃষ্টিও অনেকটাই কমে গেছে ততক্ষণে।

ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের মাথায় 'বাংলাদেশ আই হসপিটালে'র সামনে সাইদুর নেমে যায়। আমি ডান দিকে মোড় নেই। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় রিকশার ঘোমটাটা (হুড) মাথার ওপর থেকে সরিয়ে দিই। রিকশা ততক্ষণে 'বার-বি-কিউ টু নাইট' রেস্টুরেন্টের সামনে এসে পড়ে। এমন সময় রিকশার গতিটা কমিয়ে

মাথাটা হালকা ঘুরিয়ে রিকশা-চালক আমাকে বলে– স্যার, হেই দিনের গানডা একটু গাইবেন (আকাশের ওই মিটিমিটি তারার সাথে...), আমার খুব পছন্দের গান! আমি আকাশ থেকে পড়ি এক ঝটকায়। রিকশা থামাতে বলি চালককে। রাস্তার পাশে রিকশা থামিয়ে তাকে প্রশ্ন করি– 'হেই দিনের গান'ডা মানে? তার মানে তুমি কি আমারে আরও কয়েকদিন এখানে আনছ? রিকশা চালক বলে– হ' স্যার আমি আপনের বাসা চিনি। আপনেরে আমি আরও ৪/৫বার আপনের বাসায় নিয়া গেছি।

আমার আবার একটা বদ অভ্যেস আছে! রিকশায় উঠে (সবকিছু মনমতো থাকলে) নিচু স্বরে আপন মনে গান গাইতে থাকি পরিবেশ ভুলে গিয়ে! এর মধ্যে প্রধানত ভাওয়াইয়া গান আরও এদিকের ভাটিয়ালি গানই বেশি থাকে। 'ও কি- গাড়িয়াল ভাই' কিংবা 'নাইয়া রে, নায়ের বাদাম তুইলা...' অথবা বিরহ-ঘরানার গানের মাঝে 'আমার গলার হার খুলে নে...' 'আমার সোনার ময়না পাখি...'- ইত্যাদি গেয়ে থাকি বেসুরো গলায়। তবে মনের সুখে অন্য কোনো গানও যে একেবারেই মুখে আসে না তেমনটিও নয়। তবে সেসবই নির্ভর করে পরিবেশ পরিস্থিতির ওপরেই!

ওই ধারাবাহিকতায় কোনো একদিন হয়তো সেই গানটি গুনগুন করেছিলাম এই রিকশায় চড়ে! আর সেটাই মনে রেখে দিয়েছে এই রিকশাচালক। আমি ওকে উলটো প্রশ্ন করি- এই গান (আকাশের ওই মিটিমিটি তারার সাথে....) তোমার এত ভালো লাগে কেন! সে প্রথমে মুখ খুলতে চায় না। পরে আমার জেরার তোড়ে মুখ খোলে একসময়। সে যা বলল– সেটা নিম্নরূপ।

তরুণ এই রিকশাচলকের বাড়ি কুড়িগ্রামে। বয়স ২৭/২৮ হতে পারে। নাম তার একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা না হয় এই মুহূর্তে নাইবা বলি! দেখতে শুনতে একটু বেঁটে-খাটো হলেও দেহটি বেশ সুঠাম। তবে গায়ের রংটা একটু বাদামি। সে ঢাকায় এসেছে বছর দুই হবে। এর আগে সে কুড়িগ্রামেই রিকশা চালাত। কুড়িগ্রামে থাকাকালে স্থানীয় এক বালিকার সাথে তার প্রেম হয়ে যায়। মেয়েটি নাকি দেখতে শুনতে খুব সুন্দরী ছিল (ওর ভাষায়)! তারা দুজনে যখন নিজেদের অভিভাবকদের চোখে ফাঁকি দিয়ে দেখা করত, তখন নাকি মেয়েটি ওর (রিকশাচালক) হাত ধরে প্রায়ই গাইত- 'আকাশের ওই মিটিমিটি তারার সাথে কইব কথা, নাইবা তুমি এলে...'। বেতারে গানটি শুনে শুনে মেয়েটি সেটা রপ্ত করে নিয়েছিল যতটা সম্ভব! আর প্রেমিকের দর্শন পেলেই গলগলিয়ে বেরিয়ে যেত হৃদয়ের কথাগুলো এই গানের সুরে ও বাণীতে! সেই থেকে এ গানটি ওর বুকের গহিনে জায়গা দখল করে নেয়। এর মাঝে তারা নাকি বিয়ে করার প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছিল প্রায়!
কিন্তু কথায় বলে– 'Men proposes and God disposes।' একদিন এই ছেলেটির সাথে অভিসারে আসার সময় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মেয়েটি প্রাণ হারায়। এতে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে ছেলেটি। তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় ওই মেয়েটির জন্য! মাস তিনেক সময় নিয়ে ছেলেটির পরিবার অবশেষে ওকে অনুনয় করতে থাকে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে। অনেক জোরাজুরির পরে অবশেষে অন্য একটি মেয়ের সাথে সহজসরল এই ছেলেটির বিয়েও হয়ে যায় একদিন!

কিন্তু বাসর ঘরে ঘটে যায় বিশাল এক দুর্ঘটনা! ছেলেটি নিজের মোবাইল ফোনে তার প্রয়াত প্রেয়সীর প্রিয় সেই গানটি (আকাশের ওই মিটিমিটি তারার সাথে...) নববধূকে শোনায়। গান শেষে তার পুরোনো প্রেমের সকল কাহিনি নববধূর কাছে ব্যক্ত করে নেহায়েত সরলতা আর আবেগবশে! কিন্তু ঘটনা ঘটে যায় উলটোদিকে। নববধূ সেই 'প্রেম-কাহিনি' এবং গানটি শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে! রাগে বিস্ফোরিত হয় অ্যাটম বোমার মতো! স্বামীর মোবাইল ফোন এক আছাড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। ছিঁড়ে ফেলে বাসর ঘরের সকল ফুল, সাজসজ্জা। মুহূর্তেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় বাসর ঘর! ভেঙে যায় স্বপ্ন, সকল আয়োজন! নববধূর চিৎকারে ছেলের বাবা-মা এসে কোনোমতে সে রাতটি সামাল দেয়। কিন্তু 'ভাঙা আয়নার ফাটলে' আর জোড়া লাগেনি কোনোদিন!
এই অবস্থাতেই তারা বিয়ের এক মাসের মাথায় চলে আসে ঢাকায়। মোহাম্মদপুর বেড়ি বাঁধের কাছে একটি ছোট্ট বাসা ভাড়া নিয়ে পুনরায় সংসার শুরু করে। ভুলেও কখনোই আর স্ত্রীর সামনে 'সেই গানটি' শোনেনি ছেলেটি! সেই গানের প্রসঙ্গও আনেনি কোনোদিন! তবে সুযোগ পেলেই কোনো চায়ের দোকানে রেডিও কিংবা অন্য কোনো সোর্সে তার হৃদয়ের গহিনে থাকা গানটি একবার শুনে নেয় লুকিয়ে! গোপনে চোখ মুছে! এই হলো 'বেতারের' মহাশক্তি! শ্রেণি-পেশা লিঙ্গ আর বয়স ভেদে বেতার মানুষকে 'টাইম এন্ড স্পেস' ছাড়িয়ে অনুভূতির এক অনামিক স্তরে নিয়ে যেতে পারে অনায়াসেই!

চার.
প্রত্যাশা:
পরম শক্তিধর এই মাধ্যমটি (বাংলাদেশ বেতার) বাংলাদেশে তার ভূমিকা রেখে চলেছে সেই একাত্তর থেকেই। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মাধ্যমটি এখন অনেক ম্যাচিউর।

আমরা জানি, 'তথ্য, শিক্ষা এবং বিনোদন প্রদান' যেকোনো গণমাধ্যমের প্রধানতম কাজ। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ বেতার তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে অটল। বাংলাদেশ বেতার আগামীতেও এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে- আমাদের সাড়ে চার হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাঙালির যাপিত জীবনের নানান বিন্যাস, আমাদের স্বাধিকার-স্বাধীনতার সংগ্রাম আর মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে- সততা এবং বস্তুনিষ্ঠতার সাথে, এটাই প্রত্যাশা। বাংলাদেশ বেতারের জয়ের ধারা আরও বেগবান হোক। জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

*লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব,*
*প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও সাবেক অভিনেতা*

# উদ্যত তর্জনীর কবিতা

জান্নাতুল বাকেয়া কেকা

উদ্যত তর্জনীর প্রাণপুরুষ, তোমাকে চিনি।
চেনে আবালবৃদ্ধ বাংলাদেশ ও বিশ্বময়
ঢাকার রমনা রেসকোর্সের ময়দানে তুমি
চিরচেনা তর্জনী উঁচানো কাব্যের মহানায়ক।
তোমার বজ্র কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল
বাঙালির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রাণহরি হাঁক।
লাখো কোটি জনতায় পৌঁছে ছিল স্বাধীনতার সাধ।
'৭১-র সাতই মার্চের দুপুর পৌনে তিনটায় শুরু হয়ে
উন্মুখ বাঙালি হৃদয়ে বর্ষিত হয়েছিল
সেই অমীয় বাণী, উদ্যত তর্জনীর উদাত্ত আহ্বান।
সেই অনলবর্ষণের কী মধুর সুধা টানে
ঝড় উঠেছিল লক্ষ-কোটি প্রাণে।
উদ্যত তর্জনী তোলা ১৮ মিনিটে রচিত হয় মহাকাব্য।
জনতার স্রোতের মিছিলে ঠাঁই মেলা ভার
বজ্রকণ্ঠের বাণী তরঙ্গে মুখ্য হয়েছিল
বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রস্তুত হবার আহ্বান।
বাঙালি জনতার হৃদয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে
জাগিয়েছিল স্বাধিকারে বীর বাঙালির ঐকতান।
প্রতিপক্ষ কেঁপেছিল ভয়ে, কষেছিল ছক,
ষড়যন্ত্রের নানান কূটচালে মেতেছিল তারা।
রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারে অনুমতি মেলেনি
তবু সেই বজ্রকণ্ঠ ঠিকই পৌঁছেছিল বিশ্বদরবারে,
বহির্বিশ্ব ও গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত ঘরে ঘরে।
মুক্তিপাগল জনতা খেপেছিল শিকল ভাঙার পণে
জলে-স্থলে-প্রত্যন্তে গর্জে উঠেছিল গেরিলা প্রতিরোধ।
পাছে আখ্যা পেতে হয় বিচ্ছিন্নতাবাদীর কিংবা
অভিযোগ ওঠে পাকিস্তান ভাঙার গুরু অপরাধ
কী দারুণ কৌশলে অমীয় ধারায় বাণী দিয়েছিলে
ছন্দে-বর্ণে-অপরূপ কথামালায় রচিত হয়েছিল
রাজনীতির কবির উদ্যত তর্জনীর অমর এক কবিতা।
তর্জনী তোলা অনবদ্য পাঠে ছড়িয়েছিল আগুন সর্বময়
ক্ষান্ত হলো তা ১৯৭১-এর বিজয়ে ১৬ ডিসেম্বর।
বহুকাল প্রচারে ছিল না, ক্রোধে-নিষেধাজ্ঞায়
প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ মহানায়কের তর্জনী উঁচানো
কবিতা আজ ঐতিহাসিক দলিল-'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ'
উদাত্ত বজ্রকণ্ঠ নিঃসৃত সেই বাণী অনন্য সম্পদ।
উদ্যত তর্জনীর কিংবদন্তি কথাশিল্পী তিনি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

# আমি বাঙালি

শেখ ফয়সল আমীন

আমি বাঙালি
আমি অসম্ভবের বুক চিরে ছিনিয়ে আনি সম্ভব
আমার রক্তে-ধমনিতে মিশে আছে জাতিসংগ্রাম-বিপ্লব

আমি বাঙালি
আমি জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চাই মায়ের ভাষার অধিকার
আমি অকাতরে প্রাণ দেই; লক্ষ্য এই বাংলার স্বাধিকার

আমি বাঙালি
আমি মিছিলে মিটিংয়ে হারিয়ে যাই রাজপথ থেকে গ্রাম বাংলায়
আমি নিজেই নিজেকে খুঁজে পাই ছেষট্টির ছয় দফায়

আমি বাঙালি
আমি উনসত্তরের উত্তাল ঢেউ, উন্মাদ জনস্রোত
আমি শতবছরের শোষণ চেপে রাখা বিস্ফোরন্মুখ জনক্রোধ

আমি বাঙালি
আমি পরাধীনতার শেকল ভেঙে মুক্ত করি স্বাধীনতা
আমি রাজপথে রণতূর্য উড়াই ভেঙে সকল মৌনতা

আমি বাঙালি
আমি শান্তিতে রবীন্দ্রনাথ আর শক্তিতে নজরুল
আমি গ্রামের এসএম সুলতান, আমি শহুরে জয়নুল

আমি বাঙালি
আমার শাশ্বত ঠিকানা বঙ্গবন্ধুর এই বাংলাদেশ
আমি জাতিসত্তার গৌরবে উন্মীলিত অনিঃশেষ

# বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যই আমার জীবনের পাথেয় (পর্ব-১)

মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু

বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে আমি দীর্ঘদিন ছিলাম। তাই তাঁকে নিয়ে রয়েছে আমার অনেক স্মৃতি। সেই স্মৃতি কখনো মধুর আবার বেদনার। সুখস্মৃতি যেমন আনন্দ দেয়, তেমনই বেদনাও মনকে বিষণ্ন করে। তাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ছোটো পরিসরে লেখা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বঙ্গবন্ধুকে আমি সর্বপ্রথম দেখি মনে হয় ১৯৫৩ সালে। তখনো আমি শান্তিনগরেই থাকতাম। সে সময় ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন মরহুম গাজী গোলাম মোস্তফা। বঙ্গবন্ধু প্রায়ই একটা জিপে করে গাজী গোলাম মোস্তফার বাসায় আসতেন। গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেবের বাসা ছিল গলির একটু ভেতরে। কবি গোলাম মুস্তাফা ও হাবীবুল্লাহ বাহার সাহেবের বাসার মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা সেটা দিয়ে বঙ্গবন্ধু গাজী সাহেবের বাসায় যেতেন। অনেক সময় দেখতাম– বঙ্গবন্ধু গাজী গোলাম মোস্তফাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমরা পাড়ার ছেলেরা ওই রাস্তায় বসে গল্পগুজব করতাম। আমি তখন স্কুলে পড়ি। বঙ্গবন্ধুকে দেখলেই আমরা সালাম দিতাম। উনি আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন। সেই সময় আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তফাজ্জল ইসলাম (সাবেক প্রধান বিচারপতি) সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কেরামত মওলা, আনোয়ার পারভেজ, রিয়াজ উদ্দিন মানু এবং ড. ওসমান গণীসহ অনেকেই ছিলেন।

১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের একটা মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধুকে দেখি। সে নির্বাচনে এ এলাকা (কমলাপুর-শান্তিনগর-মতিঝিল) থেকে অভিনেতা সিডনির বাবা সৈয়দ মোহাম্মদ আলী নির্বাচন করেন। ওনার নির্বাচনি ক্যাম্পেইন করতে বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকটি মিটিং করছিলেন। সেই সময় বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখি। বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার আকর্ষণ ছোটো বেলা থেকেই ছিল। আমি অনেক সময় স্কুল ফাঁকি দিয়ে পল্টন ইদগাহ্ মাঠে যেতাম। তখন ওখানেই মিটিং হতো। সেই মিটিংয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা বক্তৃতা করতেন। আমি বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মুজিব ভাইয়ের বক্তৃতা শেষ হলে আমি চলে আসতাম। নির্বাচনে জয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসল। কিন্তু ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ এবং মাওলানা ভাসানীর ও সোহরাওয়ার্দী ও মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে কিছু মতানৈক্য হলো। তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলো এর জের ধরে। আমার মনে আছে ভাঙাভাঙির এই সময়ে পুরোনো ঢাকার

রূপমহল সিনেমা হলের সামনে বেশ গন্ডগোল হয়েছিল। আমি তখন কে এল জুবিলী স্কুলের ছাত্র। অতঃপর আমি কলেজে ভর্তি হলাম। অনেকদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় না। এর মধ্যে আইয়ুবের সামরিক শাসন আসলো। অনেক চড়াই-উতরাই পার হলো। সোহরাওয়ার্দীসহ অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে কারারুদ্ধ করা হলো। খুব সম্ভব ১৯৬০ সালে বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে দেখি। সেগুনবাগিচা বাজারের সামনে ট্যাক্স ডিভিশন অফিসের পাশে- একটা দোতলা বাড়িতে তিনি ছিলেন। আমি আর আমার বন্ধু ভয়েস অব আমেরিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী হেঁটে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম বঙ্গবন্ধু একটা লুঙ্গি আর হাওয়াই শার্ট পরে বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা ওনাকে সালাম দিলাম। ইকবালকে তিনি চিনতেন। ইকবাল ছিল হাবীবুল্লাহ বাহার সাহেবের ছেলে। হাবিবুল্লাহ বাহার ছিলেন কলকাতার মুসলিম লীগ নেতা। বঙ্গবন্ধু ইকবালকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমার বাবার শরীরের অবস্থা কী? হাবিবুল্লাহ বাহার সাহেব তখন অসুস্থ। কথা বলতে পারেন না। কবি নজরুলের মতোই বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছেন। ইকবাল বলল, আব্বা ভালো আছেন। তারপর জানতে চাইলেন, তোমার মা কেমন আছেন? ইকবালের মা ছিলেন বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। ইকবাল বলল, ভালো আছেন। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন– এই তুই কেমন আছিস? আমি বললাম, আছি। এই কথা বলে আমরা চলে এলাম। এর মধ্যে অনেকদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাসিক 'বর্ণালী' নামে পত্রিকা বের করি। বঙ্গবন্ধু তখন আলফা ইনসিওরেন্সে বসতেন। ওখানে গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব বসতেন। মোহাম্মদ হানিফ বসত। হানিফের বড়ো দুই ভাই সুলতান সাহেব ও মজিদ সাহেবও বসতেন। আমি একদিন ওখানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলাম।

তিনি আমাকে বললেন– এই তুই কেন আসছিস? আমি বললাম, একটা পত্রিকা বের করি। আমাকে একটা বিজ্ঞাপন দেন। আমি বিজ্ঞাপনের জন্য আসছি। বঙ্গবন্ধু হেসে দিলেন। আমাকে একশ টাকার একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। অ্যাকাউনটেন্টকে ডেকে বললেন- 'ওকে টাকাটা অ্যাডভান্স দিয়া দাও। পত্রিকা ছাপতে কাগজ লাগবে। ও তো ছাত্র। কাগজ কিনার টাকা পাবে কোথায়?' এই যে তাঁর আন্তরিকতা ও স্নেহসুলভ আচরণ এর তুলনা হয় না। ১৯৬৩ সালে একশ টাকার অনেক দাম। আমি বিজ্ঞাপনটা নিয়ে চলে আসলাম। এরপর আস্তে আস্তে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার আর ঘনিষ্ঠতা হলো। আমি একদিন বঙ্গবন্ধুকে ভীষণ রাগান্বিত হতে দেখেছি। বঙ্গবন্ধুকে এমন রাগতে কখনো দেখিনি। আমরা তখন আওয়ামী লীগ অফিসে বসা। ১৯৬৪ সাল হবে। উনি এসেই চিৎকার করে বললেন– 'তোমরা এখনো বসে আছ কেন? মানুষ মেরে শেষ করে ফেলল। কীসের হিন্দু, কীসের মুসলমান। আমরা মানুষ। কাল আমি রাস্তায় বের হব। মিছিল অ্যারেঞ্জ করো।' পরদিন 'বাঙ্গালি রুখিয়া দাঁড়াও' এই লিফলেট নিয়ে আমরা বের হলাম- বঙ্গবন্ধুর পেছনে পেছনে। আওয়ামী লীগ অফিসে প্রায়ই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হতো। একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে ডাকলেন, বললেন 'তোকে আওয়ামী লীগ করতে হবে'। গাজী সাহেবকে ডাকলেন, বললেন– 'মোস্তফা (গাজী সাহেবকে কখনো মোস্তফা কখনো গাজী দুই নামেই ডাকতেন) তোর সঙ্গে ওকে নিয়ে নে, ও সিটি আওয়ামী লীগ করবে।' তখন কাউন্সিল হচ্ছিল। আমাকে কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পাবলিসিটি সেক্রেটারি করা হয়। তখন ওয়ার্ড ছিল না, ইউনিয়ন ছিল। আমি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগে যোগ দেই। সেই থেকে আমার আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং ক্যারিয়ার গড়া। পরবর্তীতে আমি কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি হলাম। গাজী সাহেব সিটির জেনারেল সেক্রেটারি আবার কমলাপুর ইউনিয়নেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরে আমি প্রেসিডেন্টও হই। ১৯৬৪ সাল। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান নির্বাচন দিলেন। প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে সেদিন বঙ্গবন্ধুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মিলে কম্বাইন্ড অপজিশন 'কপ' করলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। সেই সময় আমরা যারা এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, প্রগতিশীল আন্দোলনে জড়িত ছিলাম সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন করেছি। শুধু তাই নয় অনেক নির্যাতন নিষ্পেষণের মধ্যে দিয়েও আমরা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দলনরত ছিলাম। একদিন জোনাকি সিনেমা হলের সামনের রাস্তার ওপর এক জনসভা হলো। সভায় এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান ও আজম খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হলেন। সভা পরিচালনা করার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। আমি সেই সভা পরিচালনা করার কাজ শুরু করলাম। আমার হাতে যে কাগজটা দেওয়া হলো তাতে দেখলাম বক্তাদের লিস্টে আমাদের মুজিব ভাইয়ের নাম নেই। এটা দেখে আমি অবাক, বিস্মিত শুধু হলাম না, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমি বললাম, মুজিব ভাইয়ের নাম নাই এ সভা আমি পরিচালনা করব না। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম পিছন দিক থেকে কে যেন আমাকে থাপ্পড় দিলো। আর বলল– 'যা লেখা আছে তাই পড়ো। বেশি বোঝার চেষ্টা করো না।' পেছনে ফিরে দেখলাম মুজিব ভাই আমার পিঠে থাপ্পড় দিয়ে এই কথাগুলো বললেন। আমি সেদিন বুঝলাম মুজিব ভাই নিজেকে ফলাও করার জন্য কোনো কিছু করেন না। আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি, সেদিনও দেখলাম- এই যে কম্বাইন্ড অপজিশন-সম্মিলিত জোটটা যাতে ঠিক থাকে সেজন্য নিজের নামটা বক্তার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে অন্যকে দিলেন। তখন অবশ্য আমার এ বুঝটা ছিল না যে, কম্বাইন্ড অপজিশনে এক দল থেকে একজনকেই বক্তৃতার সুযোগ দেওয়া হয়। নির্বাচনে জয়লাভই বড়ো, এটা আমি মুজিব ভাইয়ের মধ্যে দেখেছি। এ কারণেই সেদিন যখন আমি এটা বলেছিলাম, তখন পেছন দিক থেকে আমাকে ধমক দিয়েছিলেন। এটা এখনো আমার কানে বাজে- 'যা লেখা আছে তাই পড়ো। বেশি বোঝার চেষ্টা করো না।'

১৯৭৩ সাল। তখন খেলাধুলার মাঠে আমার খুবই পদচারণা ছিল। সাংগঠনিক ভাবে আমি ক্লাব করেছি। অনেকগুলো ক্লাব আমি চালিয়েছি। একদিন রাত দশটার দিকে আমি আওয়ামী লীগ অফিস থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামে গিয়ে আবাক হয়ে যাই। হাশেম ভাই, ফুটবল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি-ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, কনগ্রাচুলেশন। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন- তুমি তো বিদেশ যাচ্ছ। আমি বললাম– কে বলেছে আপনাকে। আমি তো কিছুই জানি না। তিনি বললেন– মনু আসছিল খেলা দেখতে মাঠে (মনু মানে টাঙ্গাইলের মান্নান সাহেব)। উনি আমাকে ডেকে বললেন আজকে একটা ঘটনা ঘটল। 'আমি বঙ্গবন্ধুর ওইখানে বসা। এর মধ্যে একটা ফাইল পাঠাইছে ইউসুফ আলী সাহেব। জিজিআর– এ একজন স্পোর্টস অর্গানাইজার যাবে। তিন সপ্তাহের একটা ডিপ্লোমা কোর্স আছে। তা ফাইলটা পইড়া বঙ্গবন্ধু আমারে বলল– ইউসুফ দেখ, একজন ডেপুটি সেক্রেটারি পাঠাচ্ছে। ও গিয়া ওইখানে কী করবে? আমাদের লোক না থাকলে একটা কথা। এই পল্টুর পুরা নাম কি বল। উনি পল্টুর পুরা নাম না লিইখা শুধু পল্টু লিইখা পাঠাইয়া দিছে।' এতে বোঝা যায় যে, কতদিকে বঙ্গবন্ধুর খেয়াল ছিল। এ ঘটনায় ইউসুফ আলী সাহেব একটু মনঃক্ষুণ্ন হন। উনি ভেবেছেন আমি বুঝি তদবির করেছি। যেহেতু কাজী আনিসুর রহমান তখন বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক ছিলেন, তার সামনেই মান্নান ভাই কথাটা বলেছেন। তখন ইউসুফ আলী সাহেব আনিসুর সাহেবকে বললেন– পল্টু আমাকেই বললে পারত। তখন কাজী আনিস বললেন, স্যার আপনি ভুল করছেন। মান্নান সাহেব আমাদের সামনে বলছেন। পল্টু তো জানতোই না কিছু। এ রকম অনেক স্নেহ-ভালোবাসা আমি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছি। আমি তখন ব্যাচেলার। সারাদিন দৌড়াদৌড়িতেই সময় কাটে। আজ এখানে ঘুমাই তো কাল ওখানে। একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ওনার রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রাগ। 'তুমি কোথায় থাকো। তুমি সিটির সেক্রেটারি। তোমাকে ডিসি খুঁইজা পায় না, এসপি খুঁইজা পায় না'। বঙ্গবন্ধুর রাগ দেখে ঘাবড়ে গেলাম। তখন ডিসি ছিল রেজাউল হায়াত আর এসপি ছিল মাহবুব উদ্দিন। কোনো একটি ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গেছেন ওনারা। বঙ্গবন্ধু বললেন– পল্টুর সঙ্গে আলাপ করো। ওরা তো আমাকে খুঁইজা পায় না। ওরা বঙ্গবন্ধুকে বললেন- স্যার ওনাকে তো ট্রেস করতে পারছি না। বঙ্গবন্ধু ওনাদের খুব বকা দিলেন। বকা দিলেন আমাকেও। বললেন, 'আমি সোহরাবকে (পূর্তমন্ত্রী) বলে দেই তুমি একটি অ্যাভান্ডেড বাড়ি নিয়ে নাও।' আমি বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বললাম, বঙ্গবন্ধু...। বঙ্গবন্ধু বললেন- 'কী হয়েছে'। আমি বললাম, সোহরাব সাহেব আমাকে সাধছে। আমি নেই নাই। বাড়িগুলো যাদের ছিল ওরা পিন্ডিতে যাক লাহরে যাক- ওদের দীর্ঘনিঃশ্বাস আছে এর মধ্যে। উনি এই ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন। বললেন, 'তোর মতো যদি আমার সব জেলার সেক্রেটারি (তখন ১৯টি জেলা ছিল) এরকম হতো তাহলে তো ভালোই ছিল।' আমি বললাম, আমি বাসা ভাড়া নিচ্ছি। আমার বাবার বাসা ছিল তখন শান্তিবাগে। সেখানে গলির মধ্যে ভিড়বাট্টা বেশি হয় বলে আমার বন্ধু ডাক্তার ওসমানের নয়াপল্টনের বাসায় আমি থাকতাম। ওই বাসার উলটোদিকেই গাজী সাহেব থাকতেন। আমার জন্য এই বাসাটা ভালোই ছিল। কেননা গাজী সাহেব ছিলেন সিটি সভাপতি আর আমি সেক্রেটারি। রাত বিরাতে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলা যেত। পরে আমি পল্টনে এজি অফিসের বিপরীতে মনোয়ারা কিন্ডারগার্টেনের পাঁচ তলায় বাসা ভাড়া নেই।

আরেকটি ঘটনা। যা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। দেখা গেল বাজেটে স্পোর্টস গুডসের ওপর হানড্রেড পার্সেন্ট এবং ক্রিকেট গুডসের ওপর হানড্রেড থার্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স বসানো হলো। এটা দেখে সমগ্র ক্রীড়াঙ্গনে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হলো। দেখা গেল ক্রিকেট প্লেয়াররা প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে ক্রিকেট ব্যাট, প্যাড ইত্যাদি পোড়াতে লাগল। ডেমোনস্ট্রেশন দেওয়া শুরু করল। এরকম একটা সময়ে হঠাৎ করে শেখ কামাল আমার বাসায় আসল। আমাকে বলল, দেখছেন প্রেস ক্লাবের সামনে ক্রিকেটার, স্পোর্টসম্যানরা ডেমোনস্ট্রেশন করছে। আমি বললাম, আমি দেখি নাই। আমি শুনেছি। ও বলল, এখন কী হবে? আমি বললাম, তুমি তোমার আব্বার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলো। কামাল আমাকে বলল, না না। আমি বলতে পারব না এ কথা। এটা আপনাকে গিয়েই বলতে হবে এবং আপনি আজকেই আব্বার সঙ্গে দেখা করেন। যাই হোক। আমার তো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে কখনো কোনো অসুবিধা ছিল না। কোনো পারমিশনের প্রয়োজন ছিল না। আমি গিয়ে হাজির হলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে।

বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখে বললেন, কিরে তুই হঠাৎ করে এসেছিস। কোনো কিছু হয়েছে নাকি? আমি খুব আমতা আমতা করে বললাম, না কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু বললেন, কী হয়েছে বল পরিষ্কার করে। আমি বললাম, বঙ্গবন্ধু স্পোর্টস গুডসের ওপর তো হানড্রেড পার্সেন্ট ট্যাক্স বসানো হয়েছে এবং ক্রিকেট গুডসের ওপর হানড্রেড থার্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স বসানো হয়েছে। এখন তো ছেলেরা বিক্ষোভ করছে। ক্রীড়াঙ্গনে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দেখ আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। তবে আমি এইটুকু বলি তোকে, তুই তাজউদ্দিনের সাথে দেখা কর। তাজউদ্দিন তোকে ভালোই জানে।'

আমি বললাম, তাজউদ্দিন ভাই কি আমাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। বঙ্গবন্ধু বললেন- 'তাজউদ্দিনকে আমার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না। কারণ আমি কিছু বললে তাজউদ্দিন কষ্ট পাবে। ভাববে আমি বোধ হয় হস্তক্ষেপ করছি। সুতরাং এটা তোকেই বলতে হবে।' বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে আমি বেরিয়ে আসলাম। চিন্তা করলাম এভাবে গিয়ে বলা যাবে না। তাজউদ্দিন সাহেবকে আমি যতটুকু দেখিছি, জেনেছি তা থেকে আমার এই ধারণা। আর এটা বাজেটের ব্যাপার। আমি এভাবে বলতেও পারি না। আমি চিন্তা করলাম কী করা যায়। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। আমি তখন ঢাকা জেলা ক্রীড়া

সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি। সেবার ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমি চিন্তা করলাম আমাদের দলের প্লেয়ারদের ব্লেজার দেবো এবং ওই অনুষ্ঠানে তাজউদ্দিন সাহেবকে প্রধান অতিথি করে আনব। তখন পদাধিকার বলে জেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলোর সভাপতি ছিলেন ডিসি। আমি ঢাকার ডিসি কামাল উদ্দিন সাহেবকে ফোন করলাম। উনি বললেন, কী খবর। আমি বললাম, কামাল ভাই একটা কাজে আপন-াকে ফোন করলাম। আমাকে তো কিছু টাকা দিতে হবে। উনি জানতে চাইলেন, কী করবেন টাকা দিয়ে।

আমি বললাম, আমরা তো ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, ছেলেদের ব্লেজার দিতে হবে। উনি বললেন, কত টাকা লাগবে। আমি কত টাকার কথা বলেছি এখন মনে নাই। উনি বললেন, ঠিক আছে। অসুবিধা হবে না। যথারীতি ব্লেজার তৈরি করে অনুষ্ঠানের সবকিছু ঠিকঠাক করে তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে গেলাম। আমি ওনাকে সালাম দিলাম। উনি বললেন, কী খবর তোমার। ভালো আছ। দেখলাম ওনার মুডটা খুব ভালো। আমি বললাম, তাজউদ্দিন ভাই আপনি তো ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের মিনিস্টার। উনি বললেন, আমি কেন ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের মিনিস্টার হব। আমি তো সারা বাংলাদেশের মিনিস্টার। আমি বললাম, যাই হোক। ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট থেকেই তো আপনি নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন। উনি হেসে বললেন, কথাটা তো একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছ। তো কী সমাচার? তুমি কী বলতে চাও? আমি বললাম, আমরা ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট ভলিবলে এইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। তা দলের প্লেয়ারদের ব্লেজার দেবো। সেই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাকে চিফ গেস্ট করতে চাই। উনি হেসে দিলেন এবং রাজি হলেন। ওনাকে চিফ গেস্ট করে ঢাকার আর যারা মন্ত্রী ছিলেন– শামসুল হক সাহেব চিফ হুইপ, শাহ মোয়াজ্জেম, মোসলেম উদ্দিন খান হাবু মিয়াসহ মোটামুটি ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের যারা ছিলেন এদের সবাইকে দাওয়াত দিলাম। এদিকে আমি ক্রীড়াঙ্গনের সিনিয়র অর্গানাইজার যারা ছিল– যেমন ওয়ারী ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি হাসেম সাহেব, ভিক্টোরিয়া ক্লাবের

**১৯৭৪ সালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটা কৃত্রিম খাদ্য সংকট করা হলো। তখন আমাকে বঙ্গবন্ধু ডেকে বললেন, লংগরখানা খোলো বিভিন্ন স্পটে স্পটে। তিনি আমাকে বলে দিলেন কীভাবে কী করতে হবে। বললেন, কর্মীদের বলো সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জ করতে। অভুক্ত লোকদের খাবার দাও।**

জেনারেল সেক্রেটারি শহিদুর রহমান কচি ভাই, নুরুজ্জামান সাহেব, ভলিবলের খবির সাহেব, ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের ওয়াজেদ ভাই এবং ফায়ার সার্ভিসের ডিরেক্টর সিদ্দিকুর রহমান সাহেব, মইনুল ইসলাম সাহেব, ইস্ট এন্ড ক্লাবের খালেক সাহেব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সাইফুদ্দিন আহমেদসহ আরও যারা সে সময়ে ক্রীড়াঙ্গনে ভালো অর্গানাইজার ছিলেন সবাইকে দাওয়াত দিলাম। মোহামেডান ক্লাবের গজনবী ভাইকেও দাওয়াত দিলাম। আমি আগেই সবার সঙ্গে কথা বলে রেখেছি যে আপনাদের স্পোর্টসগুডসের ওপর ট্যাক্স কমানোর ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য রাখতে হবে। কোনো অসুবিধা হবে না । আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনারা বক্তব্য রাখবেন। বঙ্গবন্ধু তো আমাকে বলেছেন তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। ওটার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যই এই উদ্যোগটা নিলাম। অনুষ্ঠানে সবাই আসল। তাজউদ্দিন সাহেব আসলেন। উনি দেখলেন এখানে ওনার পরিচিত অনেকেই আছেন। স্পোর্টস অর্গানাইজাররা জোরালো বক্তব্য দিলেন। তাজউদ্দিন সাহেব স্পোর্টস গুডসের ওপর হানড্রেড পার্সেন্ট ট্যাক্স রহিত করলেন। কিন্তু ক্রিকেটে থার্টি পার্সেন্ট রেখে দিলেন। যাই হোক পরদিন আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখেই বঙ্গবন্ধু মুচকি মুচকি হাসছেন। আমি সালাম দিলাম। 'আমাকে বললেন, তুই ভালোই করেছিস। এই জন্যই তোকে বলেছিলাম তুই কথা বলিস। তুই যেভাবে কাজটা করেছিস আমি তোর ওপর খুব খুশি হয়েছি। তোর বুদ্ধি আছে। আমি তখন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারি। আমি বললাম, ক্রিকেটের ওপর তো থার্টি পার্সেন্ট রেখে দিলো। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এটা নিয়া চিন্তা করিস না। আমি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে অ্যাডহক লাইসেন্স দিয়ে দিব। এই লাইসেন্সের ভিত্তিতে ক্রিকেট গুডস আনবি এবং সারা দেশের স্কুল, কলেজ, ক্লাব সবখানে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিবি। কোনো অসুবিধা হবে না।' তখন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী আনিসুর রহমান। ক্রিকেট নিয়ে তখন অনেকে অনেক কথা বলেছিল। কেউ কেউ বলেছিল ক্রিকেট ইজ এ গেম অব লর্ড। ক্রিকেটের ওপর যে বিরাট বাধা এসেছিল বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় সেদিন আমরা এই বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। এ ব্যাপারে শেখ কামালের জোরালো ভূমিকা ছিল। এই যে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট এমন একটা পর্যায়ে গেছে, খ্যাতিলাভ করেছে-এটা দেখে মনে খুব আনন্দ পাচ্ছি। যখন খেলা দেখতে যাই কিংবা কাগজে দেখি ছেলেরা ভালো খেলছে, তখনই বঙ্গবন্ধুর চেহারা- তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের দৃশ্য আমার মনে পড়ে যায়। এই মধুর স্মৃতিগুলো আমাকে যেমন আনন্দ দেয় তেমনি হৃদয়ে বেদনারও সৃষ্টি করে-বঙ্গবন্ধুকে হারানোর বেদনা।

বঙ্গবন্ধু আমাকে অসম্ভব পছন্দ করতেন। তিনি সুযোগ পেলেই আমাকে লিফট্ দিতেন। তিনি আমাকে সিটি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বর করলেন। ৭৪ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে আমাকে মহানগরের সাধারণ সম্পাদক করে দিলেন। আর তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল।

সাংগঠনিক কারণে প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। রাত বারোটায়ও ওনার কাছে যেতে পারতাম আমি। একদিন বাচ্চু মিয়া নামে চকবাজারের এক লোক (চায়ের দোকানদার)

আমার কাছে আসল। আমি তখন আওয়ামী লীগ অফিসে। আমি বাচ্চু মিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী? বাচ্চু মিয়া বলল, 'আমার পোলাটারে পুলিশ ধইরা লইয়া গেছে। আমি বললাম, কেন? ও বলল, পুলিশ কয় কি সিগারেট নাকি বেলাক করতাছে।' আমি বললাম, দেখো বাচ্চু মিয়া, আমি তো এই ব্যাপারে কিছু করতে পারব না। তুমি তো আওয়ামী লীগ করো। কদিন পর আবার এসেছে বাচ্চু মিয়া। এবার বলল, পল্টু সাব, আমারে একটু বঙ্গবন্ধুর লগে দেখা করাইয়া দিবেন। বঙ্গবন্ধুরে খুব দেখবার মন চাইছে। আমি বললাম, তুমি গিয়া কইবা আমার পোলারে ধইরা লইয়া গেছে। বাচ্চু মিয়া বলল, আমি যদি এই সব কোনো কথা কই তো আমারে কুত্তার লগে ভাত দিবেন। আমি বললাম, তাইলে তুমি বহো। আমি ওকে বসতে দিলাম। আমি কাজটা সেরে আমার গাড়িতে করে বাচ্চু মিয়াকে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে নিয়ে গেলাম। বাচ্চু মিয়াকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে উপরে গেলাম। আমি দোতলায় উঠেই দেখি ভাবি (বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব) নিজেই শর্তা দিয়ে সুপারি কাটছেন। কত সিম্পল ছিলেন বেগম মুজিব। আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'আপনে পুব দিকে রওনা দিয়া পশ্চিম দিকে আইছেন?' আমি ব্যাচেলর ছিলাম উনি জানতেন। জিজ্ঞেস করলেন, খাইছেন? আমি বললাম, না খাই নাই। লিডার কি ঘুমাইয়া গেছেন? ভাবি বললেন, না, এইমাত্র গেছেন। আপনে যান। আমি রুমে গিয়ে দেখি বঙ্গবন্ধু বালিশে হেলান দিয়ে পাইপ টানছেন। আমি সালাম দিলাম। আমাকে দেখে বললেন, কীরে তুই কি খবর নিয়া আসছিস? আমি বললাম, না কিছু কথা ছিল। আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাংগঠনিক কথা সেরে নিলাম। আলাপ শেষে বললাম, বঙ্গবন্ধু চকবাজারের চা দোকানদার বাচ্চু মিয়া আসছে। বাচ্চু মিয়ার কথা শোনে বঙ্গবন্ধু হেলান দেওয়া থেকে উঠে বসলেন। কীরে বাচ্চু মিয়ার কী হয়েছে। বাচ্চু মিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। উনি উদগ্রীব হয়ে বললেন, তুই বাচ্চু মিয়ারে কোথায় পেলি। আমি বললাম, আমি বাচ্চু মিয়াকে নিয়ে আসছি। ও আমার গাড়িতে আছে। বঙ্গবন্ধু বললেন, না তুই বস। আমি বাচ্চু মিয়াকে আনাচ্ছি। 'এই কে আছিস। পল্টুর গাড়িতে বাচ্চু মিয়া বলে একটা লোক আছে ওকে ডেকে নিয়া আস।' বাচ্চু মিয়া আসার সময়টুকুতে বঙ্গবন্ধু বাচ্চু মিয়া সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তুই জানিস, এই বাচ্চু মিয়া আমার অনেক সময় রিকশা ভাড়া দিয়েছে ওর ক্যাশ থেকে নিয়ে। তারপর কত চা খেয়েছি। কত কি করেছি। কখনো কোনো কিছুতে আপত্তি করেনি। শুধু কি আমরা। আমাদের কর্মীরা ওর দোকান থেকে কত চা-বিস্কুট খেয়েছে। কখনো না করেনি। বঙ্গবন্ধুর কাছে শুনে বুঝলাম বাচ্চু মিয়া লোকটা আপাদমস্তক আওয়ামী লীগের কর্মী। বঙ্গবন্ধুকে দেখে বাচ্চু মিয়া হাউমাউ করে কাঁদছে। বঙ্গবন্ধু তাকে জড়িয়ে ধরে ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন। এ দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তারপর বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলেন, অমুক কেমন আছে তমুক সরদার কেমন আছে। বঙ্গবন্ধু এক এক করে ধরে ধরে সবার খোঁজখবর নিলেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে অতীতের সবকিছু যেন টেলিভিশনের পর্দার মতো ভেসে উঠছে। আমার কাছে মনে হলো এটা একটা অবাক কাণ্ড! অলৌকিক ব্যাপার! তারপর আবার বাচ্চু মিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পোলাপানরা কী করে তা তো বললে না কিছু? বাচ্চু মিয়া বলল, না আছে। আমি দেখলাম যে লোকটা বেকায়দার পড়ে গেছে। আমাকে কথা দেওয়ায় সে সত্যি কথাটা বলতে পারছে না। আমি তখন বললাম, বাচ্চু মিয়ার একটা ছেলে বোধ হয় সিগারট-টিগারেট কি জানি বেচত-পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, পুলিশ তো আর স্মাগলার ধরতে পরবে না। ছোটোখাটো এদেরকেই ধরবে। আমাকে বললেন, তুমি মাহবুবকে বলে দিও। বাচ্চু মিয়াকে বললেন, বাচ্চু মিয়া তুমি বসো। বঙ্গবন্ধু ভেতরে গেলেন। কিছু টাকা নিয়ে এসে (কত টাকা আমি জানি না) বাচ্চু মিয়াকে দিয়ে বললেন, বাচ্চু মিয়া এটা রাখো। বাচ্চু মিয়া বলল, তওবা সাব। সাব আমি টেকার লাইগা আহি নাই। আপনারে এক চোখ দেখবার আইছি। আপনে আমাগো একটা ভালা লোক দিছেন। পল্টু সাব আমগো কথাবার্তা হোনে-আমরা যা কই। বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি তো এই জন্যই তোমাদের লোক দিয়েছি। বুইঝাই তো দিছি। ঠিক আছে না। না না ঠিক আছে-বলে বাচ্চু মিয়া টাকাটা বঙ্গবন্ধুকে ফেরত দিতে গেলে বঙ্গবন্ধু ধমকে বললেন, নাও এইটা। তোমার যখনই কোনো অসুবিধা হবে পল্টুকে বলো। সে আমাকে জানাবে। কোনোরকম দ্বিধা করবা না। এই যে তাঁর চরিত্রের একটা দিক। তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী। ফাদার অব দ্যা নেশন। বাচ্চু মিয়াকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন। কত কথা জিজ্ঞেস করেছেন। পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন। ওর সম্পর্কে আমাকেও অনেক কথা বললেন। তারপর কিছু টাকা এনে এই গরিব মানুষটাকে দিলেন। এই ঘটনাটা আমি আমার স্মৃতিচারণে এইজন্য বললাম-মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর মমত্ববোধ- দেশের শীর্ষ পজিশনে থেকেও, তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না।

১৯৭৪ সালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটা কৃত্রিম খাদ্য সংকট করা হলো। তখন আমাকে বঙ্গবন্ধু ডেকে বললেন, লংগরখানা খোলো বিভিন্ন স্পটে স্পটে। তিনি আমাকে বলে দিলেন কীভাবে কী করতে হবে। বললেন, কর্মীদের বলো সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জ করতে। অভুক্ত লোকদের খাবার দাও। বস্তিতে বস্তিতে খাবার পৌঁছে দাও। সেসময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ ও সিরাজ সিকদারের দল ১৬ ডিসেম্বরকে কৃষ্ণ দিবস এবং গণবাহিনী ইদের জামাতে আমাদের এমপি গোলাম কিবরিয়া সাহেবকে হত্যা করল-অস্বস্তিকর ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করল। বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে বললেন, ধৈর্যের সঙ্গে সবকিছু করো।

[পরবর্তী পর্বে সমাপ্ত]

*লেখক: মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও দলটির যুব ক্রীড়া উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এবং সভাপতি*

# আমি চোখ করেছি আয়না

শরীফ সাথী

আমি চোখ করেছি আয়না
আমার আয়নায় ফুটে ওঠে বঙ্গের ছবি।
সবুজ মাতমে মুগ্ধ শ্যামলের কমল মুখ।
পুষ্পের হাসিমাখা সুবাসে জীব আনন্দে
সানন্দে বসবাসের মায়া মধুর চাষ।

আমি চোখ করেছি আয়না
আমার আয়নায় ফুটে ওঠে বঙ্গের ছবি।
বৃক্ষের দোল খাওয়ানো লতাপাতা
কুটিরে বসবাসরত পাখির ছন্দতান
হেলানো দোলানো সবুজ পাতার কচি চাওয়া
দখিনা হাওয়ায় অনাবিল সুখ পাওয়া।

আমি চোখ করেছি আয়না
আমার আয়নায় ফুটে ওঠে বঙ্গের ছবি
ফল ফসলের ক্ষেত্র, নেত্র আমার সাজানো
মনোহর জল ডিঙি সাগর নদী
নিরবধি অবলীলায় সৌন্দর্যে মনোরম
কমা দাঁড়ির মতো মাধুর্যের রূপায়ণ।

আমি চোখ করেছি আয়না
আমার আয়নায় ফুটে ওঠে বঙ্গের ছবি
অনবদ্য ফুলের সুগন্ধে মাতোয়ারা ফড়িং দল
নৃত্য করে কাটায় সময়। মৌমাছি বিভোর আনন্দে
খুশির কলরবে ঘাসে ঘাসে প্রজাপতির ওড়াউড়ি
মাতোয়ারা দূর গগনের মেঘমালা, বকের সারি,
নীল ঘেঁষানো সূর্যের অপলক চাহনি।

আমি চোখ করেছি আয়না
আমার আয়নায় ফুটে ওঠে বঙ্গের ছবি
পাহাড়ি ঢালু সমতলে গড়া
নিদারুণ সবুজে ভরা বঙ্গ আমায় সঙ্গ দেয়
সাবলীল করে মন, স্বাধীন বাতাসের ঘ্রাণে
প্রাণের ছোঁয়ায় আবেগ অনুভূতি প্রকাশ
ভালো লাগা ভালোবাসার বন্ধন।

# স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত

নকুল শর্ম্মা

কালের প্রবাহে ইতিহাস যেখানে মজবুত
সেখানেই খুঁজে পাবে আমার স্বাধীনতার শক্ত গাঁথুনি,
অগ্নিঝরা মার্চে মহান নেতার সেই দিন, সেই ভাষণ।
রেসকোর্সের ময়দানে টান টান উত্তেজনা-
মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা ভেঙে মঞ্চে উপবিষ্ট কালজয়ী কণ্ঠ পুরুষ,
স্বাধীনতার দৃপ্ত উচ্চারণে জোয়ার আসে জনসমুদ্রে।
আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত-
সূর্যের প্রখরতায় শক্তির সঞ্চারে জেগে ওঠে জনতা,
মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
স্বাধীনতাকামী অকুতোভয় দেশমাতৃকার সন্তান।

মায়ের সম্ভ্রম রক্ষায় দীক্ষিত সূর্য সন্তান:
সংসার বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চিত্তে,
জীবনের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে মায়ের স্বাধীনতা।
মায়ের বসতভিটায় গড়ে ওঠে নতুন ঘর
উন্মুক্ত দরজায় সূর্যের আলো খেলে আপনমনে,
খোকার অপেক্ষায় বৃদ্ধা জননীর নির্ঘুম রজনি।
মায়ের একাকিত্ব হৃদয় কেঁদে ফিরে-
কখন মা বলে জড়িয়ে ধরবে মায়ের খোকা,
পাত পেতে বলবে বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে আমার।
আজও মায়ের অতৃপ্ত বুক-
খোকা আসবে, কবে আসবে আলোর রথ ধরে?
তবু মায়ের সান্ত্বনা, হাজার সন্তানের স্বাধীন মুখ দেখে।
স্বাধীনতার ইতিবৃত্তের শেষ হয় না
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের দুয়ারে জ্বালে আলোকবর্তিকা,
অনির্বাণ শিখায় ছড়িয়ে পড়ে গণ্ডির সীমানা পেরিয়ে।

# মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা (পর্ব-১)

ড. মোহাম্মদ হাননান

জেনোসাইড অর্থ 'গণহত্যা', শব্দটির এ অর্থই ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে, এটা একটা জনপ্রিয় শাব্দিক অনুবাদ। কিন্তু যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা প্রথম থেকেই বলে আসছেন, জেনোসাইড শুধু গণহত্যা নয়, এর রয়েছে আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়ংকর তাৎপর্য। গ্রিক ভাষার শব্দ 'genos' এবং ল্যাটিন শব্দ 'cide' মিলে তৈরি হয়েছিল 'জেনোসাইড' নামক সমাসবদ্ধ পদের। 'genos' জাতি অর্থের একটি শব্দ এবং 'cide' হত্যা অর্থের আরেকটি শব্দ। একটা জাতিহত্যা শুধু গণহত্যা বা কয়েক হাজার বা লক্ষের কতকগুলো লাশ নয়। জাতিহত্যা মানে একটি জাতিকে সমূলে ধ্বংস বা ধ্বংসের চেষ্টা করা। একটি জাতির ভাষা থাকে, জাতিটির সাহিত্য-সংস্কৃতি থাকে, থাকে তার শত শত বছরের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ইত্যাদি। এর সবগুলোকেই পরিকল্পিতভাবে সমূলে ধ্বংস করার নামই হলো 'জেনোসাইড'। জেনোসাইড তাই শুধু হত্যাকাণ্ড নয়।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ জেনোসাইড শব্দের সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন করে, এতে জেনোসাইড শব্দের উপরিউক্ত মূল্যায়ন প্রতিফলিত হয়েছে:

১. কোনো জাতির নাগরিকদের সমূলে হত্যা করা
২. কোনো জাতির নাগরিকদের শারীরিকভাবে ক্ষতি করা
৩. পরিকল্পিতভাবে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো জাতিসত্তার নাগরিকদের সমূলে অথবা আংশিকভাবে নিধন করা
৪. জাতিসত্তার বিকাশে বংশধারা বৃদ্ধিরোধে আরোপিত কর্মসূচি চালু করা
৫. জাতির শিশু নাগরিকদের জোর করে বাস্তুচ্যুত করা।[১]

সভ্যতার ইতিহাসের সময় থেকে অথবা সভ্যতার ইতিহাসের আগে থেকেই গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, হত্যা ও গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নির্মূল অভিযান বরাবরই জারি ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে টিক্কা খান বলেছিলেন, তিনি বাঙালির নাম-নিশানা মুছে দিতে চান। তাই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদররা পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করেছে। প্রাচীনকাল ছেড়ে আমাদের জামানায় পাকিস্তান পর্বে আমরা দেখেছি বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি মুছে জেনোসাইড শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সাল থেকেই। আর প্রকাশ্যে বাঙালি ও বাংলা অঞ্চলে নিধন শুরু হয়েছিল ১৯৪৯ সাল থেকে।[২]

অন্যদিকে ১৯৭১ সালে লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল বাঙালির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। এমনকি বাঙালির

মন্দির-মসজিদ পর্যন্ত সেদিন আক্রান্ত হয়েছিল। ছাত্ররা বাঁচতে পারেনি, তাদের অভিভাবক-শিক্ষক, লেখক-কবি, বুদ্ধিজীবী, আলেমগণও[৩] শহিদ হয়ে গিয়েছেন ২৫শে মার্চের প্রথম রাত থেকেই। বাঙালি পুলিশ, বিডিআর সেনাবাহিনীও এসব আক্রমণ থেকে বাদ পড়েনি। এটাই হলো জেনোসাইড, গ্রামবাংলার প্রবাদ 'বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়ার' মতো।

এমনকি বাংলাদেশের ইতিহাসের বেলায় অঞ্চলের নাম পর্যন্ত পাকিস্তান আমলে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। বাংলাদেশ, বঙ্গদেশ থেকে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববাংলা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গ-বাংলা শব্দ সবসময়ই ভূখণ্ডের নামের সঙ্গে জড়িয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটাকে 'মাশরিকে পাকিস্তান' বলায় বঙ্গ বা বাংলা শব্দ আপনা-আপনি উঠে যায়। এ বিষয়ে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান পার্লামেন্টের বিতর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে তৎকালীন পার্লামেন্টারিয়ান শেখ মুজিবুর রহমান স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make Bengal. The word Bengal has a history, was a tradition of it own.[৪]

১৯৫৮ সালে যখন পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়, তখন এই মাশরিকে পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তানও থাকল না। সে সময়ের পূর্ববঙ্গের ক্ষমতাচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীকালে লিখেছিলেন:

দারুণ ভয় পেলাম। ঘুম ভেঙে গেল। একটু শান্ত হয়ে শুতে যাব, হামিদ আলী সুসংবাদ জ্ঞাপন করল, মার্শাল ল অর্থাৎ জঙ্গি আইন জারি হয়ে গেছে সারা পাকিস্তানে। মন্ত্রীমণ্ডলী পরিষদ সব বাতিল। মায় শাসনতন্ত্র! রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা হয়েছে। প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খাঁ হয়েছেন জঙ্গি আইনের সর্বাধিনায়ক। চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে এরই মধ্যে। দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়াবহ বিকট। ব্যাপারটা ঠিকমতো উপলব্ধি করার মতো মনের বা দেহের অবস্থা তখন ছিল না। আবার শুয়ে পড়ি। মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙল অতি ভোরে। হামিদ আলী খবরের কাগজ নিয়ে এলো। পড়েই বুঝতে পারলাম, আমি নেই। বিরাট বড়ো বড়ো হরফে সুসংবাদ ছাপা হয়েছে। দেখলাম, দেশও নেই।

পাকিস্তান তিন ভাগে বিভক্ত। ক, খ ও গ জোনে। পূর্ব পাকিস্তানের নাম উঠে গেছে। হয়েছে গ জোন বা এলাকা। আদি সত্যিকালে নাম ছিল বঙ্গ, তারপর হলো বাংলা- লোকে গর্বভরে বলত সোনার বাংলা। ছাপ্পান্ন সালে প্রথম শাসনতন্ত্রের বিধানে নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান। আটান্ন সালে নামকরণ হলো গ জোন অর্থাৎ নামহীন। ছিল একটা অর্থপূর্ণ নাম, এখন একটা অক্ষর–'গ'।

কোথায় রইল দেশ? একটা অক্ষরে পরিণত হলো এই ভূখণ্ড। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে গাঁয়ের নাম বলি, দেশের নাম বলি বুক ফুলিয়ে। এখন বাড়িঘর দেশের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে গ জোনে। নাম-গোত্রহীন।

শুনলাম, মানুষের নামও নাকি বাতিল করা হবে। অক্ষর বা অঙ্ক দিয়ে তার পরিচয় হবে। নামের বালাই থাকবে না। কোনো একটা নাটকে– বোধ হয় রক্তকরবী– পড়েছিলাম, পাতালপুরীর অধিবাসীদের নাম নেই। নম্বর দিয়ে তার পরিচয়। কিংবা অক্ষর। আটাশের 'ক' বা ছাব্বিশের 'গ' ইত্যাদি।[৫]

এ হলো জেনোসাইড, ব্যক্তি নাম থেকে জাতি-ভূখণ্ডের নাম-নিশানা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। গণহত্যার চেয়েও এটা ভয়াবহ, কারণ এটা শিকড় পর্যন্ত উপড়িয়ে ফেলে। পাকিস্তান আমলে বাঙালিরা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাসজুড়ে আমরা যত জেনোসাইড দেখি, তার প্রায় সবটাই এহেন জাতিবিদ্বেষ থেকে জাত। সংহারকারী গোষ্ঠী কর্তৃক একটি জাতিকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়ার প্রবণতা যুগে যুগে ছিল, এখনো আছে। এসব ঘটনার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক খুব কম। কারণ ধর্মগ্রন্থগুলোতে জেনোসাইডকে কোনোভাবেই অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তবে যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি অনেক সময় যৌক্তিক হলেও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে তা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র কয়েকটি শ্লোক এখানে দেখা যেতে পারে:

১. অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে আত্মীয় বধ করে কোন্ মঙ্গল হবে তা আমি বুঝতে পারছি না।
২. ...আমাদের রাজ্যে কী কাজ? ভোগ সুখ বা জীবনেই বা কী প্রয়োজন? এরা আমাকে বধ করতে চাইলেও আমি এদের বধ করতে পারব না।
৩. হে কৃষ্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করলে আমাদের কী সুখ হবে? এরা আততায়ী হলেও এদের বধে আমাদের পাপই আশ্রয় করবে।[৬]

অর্থাৎ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কেউ যদি আততায়ীকে হত্যা করে তাহলে পাপ হবে না। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে কোনো অবস্থাতেই আততায়ীকে হত্যার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। প্রাচীন বৌদ্ধ মতাদর্শে হত্যা, গণহত্যাকে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে। এ মতাদর্শে যে কোনো সাধারণ জীবহত্যাকেই মহাপাপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাধনার মর্মবাণী বিশ্লেষণে বলা হয়েছে: যে নিজে মরে সমাজকেও ধ্বংস করিবার মতো আঘাত প্রদান করে তাহার চির অপমৃত্যু, তাহাকে সংসারের আঁধার কোণে টানিয়া তিলে তিলে যাতনায় জর্জরিত করিয়া দেয়। মানবত্ব তাহাকে চির ধিক্কার দিয়া অপায়ে নিক্ষেপ করে।[৭]

আমরা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জবুর শরিফ[৮] থেকে দেখতে পারি:

১. দুষ্ট লোকেরা তলোয়ার বাহির করে আর ধনুকে টান দেয়। কিন্তু তাহাদের তলোয়ার তাহাদের বুকেই ঢুকিবে। *[প্রথম খণ্ড, রুকু: ৩৭, আয়াত: ১৫]*
২. দুষ্ট লোকেরা আল্লাহভক্তদের জন্য ওত পাতিয়া থাকে, তাহাদের হত্যা করিবার চেষ্টা করে। *[প্রথম খণ্ড, রুকু: ৩৭, আয়াত: ২]*
৩. পবিত্রস্থানে সমস্ত কিছুই শত্রুরা ছারখার করিয়া দিচ্ছে। ...অবস্থা দেখিয়া মনে হয়

যেন কেহ বনের গাছ কাটিবার জন্য কুড়াল চালাইয়াছিল। ...তোমার পবিত্র স্থানে তাহারা আগুন লাগাইয়াছে।
*[তৃতীয় খণ্ড, রুকু: ৭৪, আয়াত: ৩-৭]*

উপরিউক্ত তিনটি উদ্ধৃতি জেনোসাইড বোঝার জন্য যথেষ্ট, 'সমস্ত কিছু ছারখার করিয়া দিয়াছে', 'বনের গাছ কাটিবার জন্য কুড়াল চালাইয়াছিল, 'পবিত্র স্থানে তাহারা আগুন লাগাইয়াছে'। ছারখার করে দেওয়া, কুড়াল চালানো, আগুন দেওয়া এসব নাম-ঠিকানা মুছে ফেলারই নামান্তর। আর এগুলো করা হয়েছিল ধর্মবিরোধীদের দ্বারাই। জেনোসাইডের শিকার এখানে ধার্মিকেরা।

হজরত মুসা আ.-এর ওপর নাজিল হয়েছিল তৌরাত কিতাব। হত্যা, গণহত্যা, জেনোসাইড সম্পর্কে তৌরাতে[৯] গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়:

১. যদি কেহ এই ধরনের কোনো জঘন্য কাজ[১০] করে তবে তাহাকে তাহার জাতির মধ্য হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে।
*[তৌরাত শরিফ, লেবীয় খণ্ড, রুকু: ১৮, আয়াত: ২৯-৩০]*

২. কোনো ইসরাইলীয় কিংবা বনি ইসরাইলদের মধ্যে বাস করা অন্য জাতির কোনো লোক যদি মোলক দেবতার নিকট তাহার কোনো ছেলে বা মেয়েকে কোরবানি করে, তবে সেই লোককে হত্যা করিতে হইবে। দেশের লোকেরাই যেন তাহাকে পাথর ছুড়িয়ে হত্যা করে।
*[লেবীয় খণ্ড, রুক: ২০, আয়াত: ১-২]*

৩. ...আমরা তাঁহাকে[১১] তাহার সমস্ত ছেলেদের এবং তাঁহার সৈন্যদলকে ধ্বংস করিলাম। সেই সময়ে আমরা তাঁহার সমস্ত গ্রাম ও শহর দখল করিয়া লইলাম এবং তাহাদের পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিলাম, তাহাদের কাহাকেও আমরা বাঁচাইয়া রাখি নাই। *[তৌরাত, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় বিবরণ, রুকু: ২, আয়াত: ৩৩-৩৪]*
জেনোসাইডের যে সংজ্ঞা তৌরাত কিতাবে তার প্রায় শতভাগ প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছি। 'জাতির মধ্য হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে', 'তাহাদের পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিলাম' এবং 'তাহাদের কাহাকেও আমরা বাঁচাইয়া রাখি নাই' ইত্যাদি বাক্য জেনোসাইডের শতভাগ প্রতিফলন। গ্রাম, শহর দখলে নিয়ে কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। এর চেয়ে বড়ো জেনোসাইড আর কী হতে পারে! তৌরাত কিতাবের অনুসারী আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্রের মধ্যেও এই কঠিনতা বিদ্যমান।

ইঞ্জিল[১২] কিতাবে যুদ্ধের কথা আছে, আছে জাতির বিরুদ্ধে জাতির জাতি-বিদ্বেষের কথা:

১. তোমাদের কানে যুদ্ধের আওয়াজ আসিবে আর যুদ্ধের খবরাখবর তোমরা শুনিতে পাইবে। ...এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে এবং এক রাজা অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। *[ইঞ্জিল শরিফ, প্রথম খণ্ড, মথি লিখিত, রুকু: ২৪, আয়াত: ৬-৮]*

২. ...ঈসা তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার ছোরা খাপে রাখো। ছোরা যাহারা ধরে তাহারা ছোরার আঘাতেই মরে।
[প্রথম খণ্ড, মথি লিখিত, রুকু: ২৬, আয়াত: ৫২-৫৩]।

৩. আমাদের এই যুদ্ধ তো কোনো মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং তাহা অন্ধকার রাজ্যের সমস্ত শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীর বিরুদ্ধে, অন্ধকার দুনিয়ার শক্তিশালী রুহদের বিরুদ্ধে। ...তাই তোমরা যুদ্ধের জন্য খোদার দেওয়া সমস্ত সাজ-পোশাক পরিয়া লও, যেন শয়তান যেদিন আক্রমণ করিবে সেইদিন তোমরা তাহাকে রুখিয়া দাঁড়াইতে পার।
*[১০ম খণ্ড, ইফিষীয়র বর্ণনা, রুকু: ৬, আয়াত: ১২-১৩]*

৪. তোমাদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি কোথা হইতে আসে?... তোমরা খুন করো এবং লোভ করো কিন্তু যাহা চাও তাহা পাও না।
*[২০তম খণ্ড, ইয়াকুব বর্ণিত, রুকু: ৪, আয়াত: ১-২]*
উদ্ধৃত অংশের মাধ্যমে ইঞ্জিল শরিফের সমকালে সংঘটিত যুদ্ধ, জাতি-বিদ্বেষ, খুন ইত্যাদির একটা আভাস মেলে।

পবিত্র কোরআনেও হত্যা, যুদ্ধ, সন্ধি, যুদ্ধবন্দি ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়া হাদিস দ্বারাও এ বিষয়গুলো নানাভাবে মানুষের কাছে এখন সুলভ। কোরআন-এর[১৩] এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত:

১. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; তবে সীমালঙ্ঘন কোরো না। *[সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯০]।*

২. ফেতনা[১৪] হত্যার চেয়ে মারাত্মক।
*[সুরা বাকারা, আয়াত: ১৯১]*

৩. ...পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা... ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড়ো অন্যায় আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া, ...কাবা শরিফে এবাদতে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।
*[সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৭]*

৪. ...তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না। *[সুরা নিসা, আয়াত : ২৯]।*

৫. যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ, তার জন্য অভিশাপ।
*[সুরা নিসা, আয়াত: ৯৩]*

৬. ...নরহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন তাতে দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণরক্ষা করল।
*[সুরা মায়িদা, আয়াত: ৩২]*

৭. আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কোরো না।
*[সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৩]*

তাফসির ইবনে কাসির[১৫] গ্রন্থে সুরা মায়িদার ৩২ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃত অংশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কাউকে

বিনা কারণে হত্যা করে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা করে ফেলল। কেননা, আল্লাহর কাছে সমস্ত সৃষ্টিজীব সমান। ...হত্যা হচ্ছে পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ। ...কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেই সে জাহান্নামি হয়ে যায়'। আয়াতটির তাফসিরে আরও উল্লিখিত হয়েছে, 'কাউকে দেশ থেকে বের করে দেওয়াও হারাম'। এই একজনকে হত্যা করলে দুনিয়ার সবাইকে হত্যা করল প্রসঙ্গে গণহত্যার বিষয়টি এসে যায়, অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের ভাষায় একজন মানুষকেই হত্যা করলে গণহত্যা হয়ে যায়। সুরা নিসার ২৯ নম্বর আয়াতের বিষয়ে হজরত জরির রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলে পাক সা. বলেছেন, 'একে অন্যকে হত্যা করো না, কেননা এটি কুফরি কাজ'।[১৬] সুরা বাকারায় ১৯১ এবং ২১৭ উল্লিখিত 'ফেতনা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসিরকারগণ লিখেছেন, যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, খুনখারাবি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এজন্য তা বর্জনীয়। কাবাঘর এলাকায় এবং পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা, খুন-হত্যা করা আরও বেশি নিন্দনীয়। কিন্তু মানুকে সত্য ধর্ম গ্রহণে বাধা দেওয়া আরো বড়ো অপরাধ। দেশত্যাগে বাধ্য করাও বড়ো অপরাধ।[১৭] এখানে মানুষকে শিকড়চ্যুত করার বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। যখন মানুষকে তার বংশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন সে তার নিশানা বা পরিচয় হারিয়ে ফেলে।

'জেনোসাইড ও ধর্ম' শিরোনামে মনে হবে জেনোসাইডের সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, ধর্ম এবং জেনোসাইড পরস্পরবিরোধী দুটি শব্দ। ধর্ম কখনো জেনোসাইড করতে উৎসাহ বা সমর্থন দিতে পারে না। ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে হানাহানি, রক্তারক্তি, বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে। অনেকে মনে করেন, দুনিয়ার ইতিহাসে ইসলামের আবির্ভাবের পর খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে অনেকগুলো ক্রুসেড ও জেহাদ সংঘটিত হয়েছে।[১৮] কিন্তু এগুলো আদৌ ধর্মীয় সংঘাত ছিল কিনা তা কখনো গবেষণা করে দেখা হয়নি। যদিও অনেক লেখক-গবেষক-ইতিহাসবিদ এগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু বর্তমান সময়ের অভিজ্ঞতা আমাদের এ সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে যে, এগুলো ছিল লুটেরা, জবর দখলকারী, জাতি-বিদ্বেষে প্রলুব্ধ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত।

২০০৩-২০০৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তখন আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিকচেনির নেতৃত্বে লুটেরারা একে 'ক্রুসেড' বলে অভিহিত করেছিল। ইরাকে তেল কোম্পানি দখল ও লুটপাটের মধ্য দিয়েই তথাকথিত এই ধর্মযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। খ্রিষ্টান-মুসলমানরা এখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করেনি বা অন্য কোনো ধর্মীয় সম্পর্কও এখানে রেষারেষির ভূমিকা পালন করেনি। আরও মনে রাখতে হবে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারিখ আজিজ ছিলেন একজন খ্রিষ্টান নেতা। সুতরাং আমেরিকান লুটেরারা এটাকে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বললেও এটা ছিল তেলক্ষেত্র দখলের একটা লড়াই।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচার আন্দোলনের একজন সংগঠক লিখেছেন:

ধর্মীয় কারণে হত্যা সংঘটিত হয়েছে দুই ধরনের: একটি আন্তঃধর্মীয়, অপরটি স্বধর্মীয়। ইউরোপে খ্রিষ্টানরা মুসলমান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যেমন ক্রুসেড করেছে - প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা বা অন্য চার্চের অনুসারীরা পরস্পরকে হত্যা করেছে। একইভাবে মুসলমানরা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের যেমন হত্যা করেছে তেমনি শিয়া-সুন্নিরা পরস্পরকে হত্যা করেছে, আবার সুন্নিরা নিজেদের মাজহাবের লোকদেরও হত্যা করেছে। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হচ্ছে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেই সময় দখলদার পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী জামায়াত ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সুন্নি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। বাংলাদেশে তারা ইসলামের নামে যাদের হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে, যাদের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কিংবা লুট করেছে, তাদের অধিকাংশ সুন্নি মুসলমান ছিল। আন্তঃধর্মীয় বা স্বধর্মীয় এসব যুদ্ধজনিত হত্যাকাণ্ড কোনো অংশে কম নৃশংস ছিল না।[১৯]

কিন্তু এখানে প্রকৃত সত্য কী! প্রথম কথা হচ্ছে, 'সুন্নি' কোনো মাজহাবের নাম নয়। শিয়াদের থেকে অন্য মুসলমানদের পৃথক করতে 'সুন্নি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। মাজহাব হচ্ছে, হানাফি, হাম্বালী, শাফি, মালিকী - এ চারটি। এদের মধ্যে কোনো আন্তঃবিরোধের কখনো লড়াই হয়নি, বরং এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাজহাব (ব্যাখ্যা)-র প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এ পোষ্য রাজাকার-আলবদররা বাংলায় আক্রমণ চালিয়েছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং বাঙালি জাতি বিদ্বেষই বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে ধ্বংস করতে তাদের উত্তেজিত করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের পর কি আমরা দেখিনি, এসব পরাজিত গোষ্ঠী ক্ষমতায় এসে হঠাৎ করে আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মুছে দিলো, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাল।

পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী ছিল এক ভয়াবহ দানব-প্রজাতি, ১৯৪৭ সালের পর তারা বেলুচিস্তানে ইদের জামাতের ওপর হেলিকপ্টার থেকে বোমা নিক্ষেপ করে বালুচদের হত্যা করেছিল। এ থেকেও বোঝা যায়, পাকিস্তানিরা জাতি বিদ্বেষী একটি শক্তি। ধর্ম ওদের কাছে কিছু নয়।

পাকিস্তান আন্দোলনে সুন্নি মুসলমানরা অংশগ্রহণও করেননি। সুন্নি মুসলমানদের বড়ো সংগঠন দেওবন্দ আলেমদের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর নেতা মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ভারত বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। এজন্য জিন্নাহ ১৯৪৬ সালে আলেমদের সংগঠনে বিভক্তি আনেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে নতুন সংগঠন তৈরি হয়। তারা পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালান। এ অংশের নেতা মাওলানা জাফর আহমেদ উসমানী পরে স্বীকার করে বলেছিলেন, জিন্নাহ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।[২০] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ[২১] প্রথম দিনেই 'পাকিস্তান' নামক ভূখণ্ডে জেনোসাইডের গন্ধ পান। তিনি বলেন, দুনিয়ার কিছু অংশ পবিত্র, আর সারা দুনিয়া অপবিত্র তা কী করে সম্ভব! আর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে

জেনোসাইডের প্রতিটি অক্ষর দিন দিন পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, এর পেছনে ইসলামি প্রেরণা নেই। পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের হত্যা করেনি, তারা হত্যা করেছে বাঙালিদের। বাঙালিদের নিয়ে তাদের ছিল কৌতুককর নানা দৃষ্টিভঙ্গি। বাঙালিদের তারা মুসলমান তো দূরের কথা, মানুষই মনে করত না।[২২]

*তথ্যসূত্র:*

১. *১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের জেনোসাইড বিষয়ক কনভেনশনের '২৬০ অ (৩)' প্রস্তাবে 'জাতিগত' নিপীড়নের পাশাপাশি বর্ণ ও ধর্ম, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ চিহ্নহীন করে দেওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।*

*এ বিষয়ে আরও দেখুন, মফিদুল হক: জেনোসাইড নিছক গণহত্যা নয়, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭ সংস্করণ।*

*বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী: আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সহজপাঠ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ২০০৯,*

*প্রতিচিন্তা, (মতিউর রহমান সম্পাদিত) এপ্রিল-জুন ২০১৬, সংখ্যায় প্রকাশিত মো. ফজলে রাব্বির পর্যালোচনা-প্রবন্ধ, 'মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইড: অমীমাংসিত বিষয় ও মানবতার দায়'।*

*আরও দেখুন, সত্যব্রত ঘোষাল: বিষয় অভিধান, সোপান, কলকাতা, ২০২২, পৃষ্ঠা ৯৫।*

২. *স্মরণ করুন ১৯৪৯ সালের নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুরে এবং রাজশাহীর নাচোলে নির্বিচারে কৃষক হত্যার ইতিহাস।*

৩. *২৫শে মার্চ রাতে ঢাকার হাতিরপুল বাজার মসজিদের ইমামের লাশ রাস্তায় পড়ে থাকার সাক্ষ্য দিয়েছেন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। দেখুন স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬৩।*

*আরও দেখুন, মফিদুল হক সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশিত গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য, অষ্টম পর্ব, ঢাকা, ২০১৯ গ্রন্থ, যেখানে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমামকে মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতার অভিযোগে পাকিস্তানি সৈন্যরা একশত টুকরো করে হত্যা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।*

৪. *পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, ২৫শে আগস্ট ও ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫। সূত্র : Shaikh Mujib in Parliament (1955-1958), Edited by Shahryar Iqbal, Agamee Prokashani, Dhaka, 1999, PP. 24, 25.*

৫. *আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, প্রথমা সংস্করণ, ঢাকা, ২০২০, পৃষ্ঠা ১৩-১৪।*

৬. *মুরারীমোহন শাস্ত্রী ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্লোক: ৩১, ৩২-৩৪, ৩৫, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ২৩-২৫।*

৭. *বিশুদ্ধ মার্গ ও বৌদ্ধ সাধনা, প্রফেসর পান্নাওয়াংসা ভিক্ষু সম্পাদিত, বুদ্ধ শিক্ষা নির্বাহী পরিষদ, তাইপেই, তাইওয়ান, ১৯৩৬।*

৮. *জবুর শরিফ নাজিল হয়েছিল নবি হজরত দাউদ আ. এর ওপর। এখানে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ১৯৯৮ সংস্করণ থেকে।*

৯. *তৌরাত-এর উদ্ধৃতিগুলো নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত তৌরাত শরিফ থেকে, ঢাকা, ১৯৯৮ সংস্করণ।*

১০. *'এই ধরনের কোনো জঘন্য কাজ' বলতে এখানে 'সমকাম'কে বোঝানো হয়েছে।*

১১. *এখানে 'তাঁহাকে' বলতে হিযবানের বাদশাহ সিহোনের কথা উল্লিখিত হয়েছে।*

১২. *ইঞ্জিল শরিফ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা ১৯৮০ সংস্করণ।*

১৩. *পবিত্র কোরআনের এসব আয়াতের অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে, বিচারপতি হাবিবুর রহমান: কোরআন শরিফ: সরল বঙ্গানুবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২ সংস্করণ এবং মুফতি শাফি'র তাফসিরকৃত পবিত্র কোরআন করীম, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, মদিনা, ১৪১৩ হিজরি থেকে।*

১৪. *'ফিৎনা' বা 'ফেতনা' আরবি শব্দ। এর অর্থ দাঙ্গা, ধর্মীয় নির্যাতন, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। মোহাম্মদ হারুন রশিদ সম্পাদিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০২০, পৃষ্ঠা ৩৩১।*

১৫. *আবুল ইসমাইল ইবনে কাসির ইসলামী বিশ্বে শ্রেষ্ঠ তাফসিরকার হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর তাফসিরকৃত কোরআনের ব্যাখ্যা মুসলমানদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর কিতাবটি তাফসির ইবনে কাসির নামেই সবমহলে পরিচিত। দেখুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-র প্রকাশিত তাফসির ইবনে কাসির, ঢাকা, ২০০০।*

১৬. *মাওলানা আমিনুল ইসলাম: তাফসিরে নূরুল কোরআন, পঞ্চম খণ্ড, (আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২), এ কিতাবে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, পৃষ্ঠা ২৪।*

১৭. *তাফসিরে মাজেদি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫, মাওলানা আমিনুল ইসলামের পূর্বোক্ত পঞ্চম খণ্ড কিতাবে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৪।*

১৮. *এরকম ধারণা দুনিয়া জোড়া অনেক লেখক-গবেষকদের মধ্যেই রয়েছে। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধী বিচার আন্দোলনের একজন সংগঠক লিখেছেন, 'পৃথিবীতে যখন থেকে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে নতুন ধর্মের অনুসারীরা যেমন ধর্মবিশ্বাসের কারণে নিহত হয়েছে, অপর দিকে ধর্মীয় কারণে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে 'ধর্মযুদ্ধে'র নামে হত্যা করেছে। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' ও 'ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাকে' যে সূত্র থেকে ধর্মীয় কারণে শহিদের সংখ্যা উদ্ধৃত করে সেটি হচ্ছে ডেভিড ব্যারেট, টড জনসন ও জাস্টিন লং-এর 'ওয়ার্ল্ড ক্রিশ্চিয়ান এনসাইক্লোপেডিয়া'। এতে আমরা দেখি ধর্মীয় কারণে নিহতের শীর্ষে হচ্ছে মুসলমানরা। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসের কারণে নিহত মুসলমানদের সংখ্যা ৮ কোটি, নিহত খ্রিষ্টানের সংখ্যা ৭ কোটি, হিন্দু ২ কোটি, বৌদ্ধ ১ কোটি, ইহুদি ৯০ লক্ষ, নৃ-ধর্মীয় গোষ্ঠী ৬০ লক্ষ, শিখ ২০ লক্ষ, বাহাই ১০ লক্ষ এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী ৫০ লক্ষ। গত শতাব্দীতে নাস্তিকরা হত্যা করেছে ৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার মানুষকে, মুসলমানরা হত্যা করেছে ৯১ লক্ষ ২১ হাজার জন, নৃ-ধর্মীয় গোষ্ঠী হত্যা করেছে ৭৪ লক্ষ ৬৯ হাজার জন, খ্রিষ্টানরা হত্যা করেছে ৫৫ লক্ষ ৩৮ হাজার জন, মহাযান*

বৌদ্ধরা হত্যা করেছে ১৬ লক্ষ ৫১ হাজার জন, হিন্দুরা হত্যা করেছে ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার জন, জরথস্ত্রুপন্থিরা হত্যা করেছে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার জন'।

উদ্ধৃতিটির বিস্তারিত দেখুন বিচারপতি গোলাম রব্বানী রচিত আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সহজপাঠ বইয়ে শাহরিয়ার কবিরের ভূমিকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১৪-১৫।

১৯. শাহরিয়ার কবির, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫।

২০. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখতে পাবেন, ড. মোহাম্মদ হাননান: বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজের ভূমিকা গ্রন্থে, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২২।

২১. উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, 'মুসলিম লীগ বর্ণিত পাকিস্তান পরিকল্পনাটি সম্ভবপর সমস্ত দিক থেকে আমি বিচার করে দেখেছি। ...ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যে এর কী ফলাফল ঘটতে পারে একজন মুসলমান হিসেবে আমি তা যাচাই করে দেখেছি। পরিকল্পনাটির সমস্ত দিক বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এটি শুধু সারা ভারতের পক্ষেই নয়, বিশেষ করে মুসলিমদের পক্ষে হানিকর।

একথা স্বীকার না করে পারছি না যে, পাকিস্তান শব্দটাই আমার কাছে অরুচিকর। এ থেকে মনে হয় পৃথিবীর কতকাংশ শুদ্ধ আর বাকি সব অশুদ্ধ। শুদ্ধ আর অশুদ্ধ বলে এলাকা ভাগ করা ইসলাম বহির্ভূত; এর সঙ্গে বরং সেই গোঁড়া ব্রাহ্মণের মিল বেশি যা মানুষ আর দেশকে শুচি আর ম্লেচ্ছ ভাগ করে এই ভাগাভাগি ইসলামের আদত ভাবকেই নস্যাৎ করে। ইসলামে এ ধরনের ভাগাভাগির কোনো স্থান নেই।

অধিকন্তু, এরকম মনে হয় যে, 'পাকিস্তান পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে একটা হার মানার লক্ষণ। ইহুদিদের জাতীয় বাসভূমির দাবির ছকে এটি খাড়া করা হয়েছে'। [মাওলানা আজাদ: ভারত স্বাধীন হলো, অনুবাদ: সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]।

২২. দেখুন, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার কুশিলব, জেনারেল রাও ফরমান আলীর গ্রন্থ বাংলাদেশের জন্ম, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬। এখানে ফরমান আলী তার লেখা বই শুরুই করেছেন এভাবে,

'বাঙালি বাবু, বাঙালি জাদু ও ভুখা বাঙালি' আমাদের ছোটোবেলায় এই তিনটি বিশেষ কথাই আমরা বাংলা সম্পর্কে শুনেছি। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা প্রসিদ্ধ তার শিক্ষিত কেরানিদের জন্য– যাদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। ...এই প্রেক্ষাপটে বাঙালি বাবু বলতে তাৎক্ষণিকভাবে এমন একদল সংবেদনহীন ও হিসাবযন্ত্রের মতো মানুষের ছবিই চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

বাঙালি জাদুরও নিজস্ব একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। ...আমরা শুনেছি, পশ্চিম ভারত থেকে একবার একদল লোক, অবশ্যই পুরুষ, বাংলায় গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ...শুধু বলা হয়েছে যে, তারা বাংলার মায়া জালে আটকা পড়েছে। ...সম্ভবত বাঙালি রমণীদের সম্মোহনকারী চোখ ...এটা ছিল বাঙালি জাদুর কাজ। ধ্বংসকারী বন্যার

পাশাপাশি অতি উচ্চ জন্মহারের কারণে বাংলা ক্ষুধার্ত মানুষের দেশে পরিণত হয়েছিল। ...মুসলিম বাঙালিরা খাদ্যের অন্বেষণে স্বদেশ ছেড়ে দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। এই প্রেক্ষাপটেই ভুখা বাঙালি কথাটির প্রচলন হয়েছিল'। [রাও ফরমান আলী, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা. ৬-৭]।

মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও লেখক মুনতাসীর মামুন জানিয়েছেন, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'গাদ্দার' বলে গালি দিত। কোনো কোনো পাকিস্তানি শেখ মুজিবকে 'bastard' বলে তাঁকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। ড. মামুন জনৈক পাকিস্তানি জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মালিকের আত্মজীবনী উদ্ধৃত করে আরও লিখেছেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের 'নিগার' হিসেবে মনে করত'। [মুনতাসীর মামুন: ইতিহাসপাঠ ১১তম খণ্ড, কথাপ্রকাশ, ঢাকা ২০২১, পৃষ্ঠা ১৯৮, ২২৩]।

আমি এ 'নিগার' শব্দটির অর্থ অভিধানে খুঁজে দেখলাম, শব্দটি ফারসি, যার কয়েকটি অর্থের একটি হলো 'কালি'। [মোহাম্মদ হারুন রশিদ: বিদেশি শব্দের অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০২০]। এটা যদি কালো কালিকে মনে করা হয়ে থাকে, তাহলে বাঙালিদের বর্ণকে পাকিস্তানিরা উপহাস করে এটা বলে থাকবে। কাজী রফিকুল হক সম্পাদিত বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি ও উর্দু শব্দের অভিধান-এ (বাংলা একডেমি, ২০০৪] বলা হয়েছে, 'নিগার' শব্দের একটি অর্থ 'সুন্দরী নারী'। এটাও যদি হয়, তাহলে রাও ফরমান আলীর বাঙালি সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে একটা মিল পাওয়া যায়। তবে সার্বিকভাবে বাঙালিদের নীচু জাতের মনে করা হতো, হেয় চোখে দেখা হতো। বাঙালিদের 'খাটো' মনে করে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হতো না, নানা অজুহাতে সকল সেক্টরেই বাঙালিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হতো।

[পরবর্তী পর্বে সমাপ্ত]

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

# মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের শহিদগণ

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ প্রায় ৫৩ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনায় আজ বাঙালিদের কাছে প্রমাণিত যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী একাত্তরে যেসব নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত করেছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃজনশীল সমাজ গঠনে যাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। আর এই লক্ষ্যে তারা এদেশের বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী ও সৃজনশীল বাঙালিদেরকে খুঁজে খুঁজে গ্রেপ্তার করে অমানুষিক নির্যাতনের পর হত্যা করে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা হত্যা করে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন নিবেদিত কর্মীকে যাঁরা অধিকারের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ঢাকা বেতার কেন্দ্রসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচারের জন্য বাঙালি বেতার কর্মীরা পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বেতার কর্মীরা বঙ্গবন্ধুকে জানালে তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন:

রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবে না।

বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ ত্বরিতগতিতে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও রংপুর বেতারকেন্দ্রে পৌঁছে গেলে এসব বেতার কেন্দ্রের দেশপ্রেমিক বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কর্মবিরতির ঘোষণা দেন। অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ পরদিন ৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বেতারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করার অপরাধে

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বেতার কর্মীদেরকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের ৬ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকে ৩ জন কর্মীকে বন্দি করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত সেনাছাউনিতে নিয়ে যায়। তাঁরা হলেন: মো. মহসিন আলি (বেতার প্রকৌশলী), হাবিবুর রহমান (সহকারী) ও আবদুল মতিন (সহকারী)। এই খবর জানতে পেরে বন্দিদের পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আইনুদ্দিনের বোয়ালিয়াস্থ বাসায় গিয়ে বন্দি বেতার কর্মীদেরকে মুক্ত করে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু আইনুদ্দিন টেলিফোনে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদেরকে জানায় যে, ৩ জন বেতার কর্মীই মুক্তিবাহিনীর সদস্য, ভারতের দালাল তথা পাকিস্তানের শত্রু। তাই তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

পাকিস্তানি সৈন্যরা ৩ জন বেতারকর্মীকে শহিদ শামসুজ্জোহা হলের নির্যাতন কক্ষে বন্দি রেখে অমানুষিক নির্যাতন করে। ৭ মে গভীর রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যার পর তাঁদেরকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। তা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজশাহী বেতারের এমএলএসএস জয়নাল আবেদীনকেও হত্যা করে। উল্লেখ্য, রাজশাহী শহর দখল করার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাউনি স্থাপন করে। তারা শহিদ শামসুজ্জোহা হলের বিভিন্ন কক্ষকে নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করত। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে স্বাধীনতাকামী নিরীহ জনগণকে ধরে এখানে এনে অমানুষিক নির্যাতনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করে সেখানে মাটি চাপা দিত। স্বাধীনতার পর এই বধ্যভূমিতে অনেক নর-কঙ্কাল পাওয়া গেছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্য মোহাম্মদ সেতাব উদ্দিন ও তাঁর বড়ো ভাই রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের সহকারী হাবিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকেই রাজশাহী শহরস্থ লক্ষ্মীপুরে নিজেদের বাড়িতে থাকতেন। রাজশাহী পুলিশ লাইনের সন্নিকটেই ছিল তাঁদের বাড়ি। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ছিল রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে গোদাগাড়ি থানার প্রেমতলি কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা না থাকার কারণে চাকরি ও লেখাপড়ার জন্য তাঁরা দুই ভাই শহরে বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালে গোদাগাড়ি থানা ন্যাপ (ওয়ালি-মোজাফফর)-এর সাধারণ সম্পাদক সেতাব উদ্দিন রাজশাহী আইন কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান রেডিও ঘোষণার মাধ্যমে ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। এই ঘোষণার পর দেশের অন্যান্য শহরের মতো রাজশাহী শহরবাসীও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিলে মিছিলে শহর প্রকম্পিত করে তোলেন। এসব প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ছাত্রনেতা সেতাব উদ্দিন। তা ছাড়াও ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকে তিনি অন্যান্য ছাত্র ও যুবকদেরকে নিয়ে রাজশাহী শহর ও গোদাগাড়ি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ২৫শে মার্চের পর থেকে তিনি অন্যান্য ছাত্র ও যুবকদেরকে সংগঠিত করে ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের সঙ্গে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এই সম্মিলিত বাহিনী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজশাহী শহর মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করে রাজশাহী শহর দখল করার পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সেতাব উদ্দিন অন্যান্যদের সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। মুক্তিযুদ্ধের ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাব-সেক্টর অধিনায়ক

*রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে স্থাপিত শহিদ বেতার কর্মীদের নামফলক*

*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ যেখানে বেতার কর্মীদেরকে হত্যা করে মাটি চাপা দেওয়া হয়*

ক্যাপটেন গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়াও তিনি লালগোলা সাব-সেক্টর অধিনায়কের সহযোগিতায় গেরিলা বাহিনী সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২৫শে মার্চের পর থেকে ৫ মে পর্যন্ত হাবিবুর রহমানও চাকরিতে অনুপস্থিত থেকে বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করছিলেন। রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করার বিষয়ে গোপনে তিনি তাঁর সহকর্মী মো. মহসিন আলি ও আবদুল মতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক তাঁদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি ৬ মে বেতার কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। তখন বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক এম সাইফুল্লাহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করায়।

সেতাব উদ্দিনের পিতা ৭৫ বছর বয়সি হাশিম উদ্দিন সরকার গ্রামের বাড়িতেই বসবাস করতেন। তাঁর সন্তানের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অপরাধে বিজয়ের পূর্বের দিন অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর রাত ৯টার সময় তাঁকে বাহির বারান্দায় গুলি করে হত্যা করা হয়। সেতাব উদ্দিন আরও জানান, পার্শ্ববর্তী কমরপুর গ্রামের বাসিন্দা ও পিরিজপুর স্কুলের শিক্ষক মওলানা আবুল কাশেম এলাকাবাসীর বিপদে-আপদে এগিয়ে আসতেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা একজন নারীকে ধরে জোরপূর্বক সেনাছাউনিতে নিয়ে যাওয়ার সময় সেই নারী প্রাণরক্ষার জন্য চিৎকার করতে থাকেন। এই সময় মওলানা আবুল কাশেম সাইকেল যোগে স্কুলে যাচ্ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে এর প্রতিবাদ করেন এবং সেই নারীকে উদ্ধার করে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। সেই নারী দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ক্ষিপ্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা মওলানা আবুল কাশেমকে গুলি করে হত্যা করে।

রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের শহিদদের বিষয়ে এলাকাবাসী তেমন একটা অবগত নন। বেতার কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদদের বিষয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা প্রয়োজন। সরকারিভাবে এই শহিদদের বিষয়ে আলোচনা হলে বর্তমান প্রজন্ম শহিদদের আত্মত্যাগের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে বলে শহিদ পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।


তথ্যসংগ্রহ

সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেতাব উদ্দিন (শহিদ পরিবারের সদস্য), মুক্তিযোদ্ধা মো. নওশের আলি, মুক্তিযোদ্ধা মো. শাহজাহান আলি

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র ২য় খণ্ড, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০০৪

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস সেক্টর ৭, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, মার্চ ২০০৬

দৈনিক সোনার দেশ, ২৬ মার্চ ২০১৬

বরেন্দ্র বাতিঘর, রাজশাহী সিটি করপোরেশন স্মারকগ্রন্থ ২০১১

*রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের কর্মী শহিদ হাবিবুর রহমান*

*লেখক: স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাবন্ধিক*

# বীরাঙ্গনা মা

শরিফুল আলম

মা ডেকে কয় দেখছোস খোকা একাত্তরের যুদ্ধ?
খোকা হেসে কয়, হ্যারে মা তুই যে কি বুদ্ধু!
একাত্তর সে কবেকার কথা আমি তো হলাম কাল,
মা বলে, ওরে তবুও যে আমি বয়ে বেড়াই সেই গাল।
ছেলে রেগে কয় বল মা বল কে দেয় কী গাল তোরে?
এক হ্যাঁচকায় দুভাগ করব টুঁটিটা টেনে ধরে।
মা বলে সোনা কজনার তুই ধরবি টুঁটি টেনে?
সত্য কখনো গোপন থাকে না, জনে জনে, গ্যাছে তা জেনে।
মা বাবারে গুলি করে মেরে আমারে নিল যে তুলে,
কয় জনে যে ছিঁড়ে ছুটে খেল কি করে বুঝাব বলে।
জীর্ণ শরীরে শীর্ণ বস্ত্রে ঘুরেছি যে কত কাল,
যেখানে যাহারে আপন ভেবেছি সেই দিয়েছে গাল।
মুক্তিযোদ্ধা জনা কয়েক ছিল তারা নিল সাথি করে
ভালো মনে নেই, কোন ক্ষণে যে, পেটে ধরে ছিলাম তোরে।
তুই যে আমার বুকের মানিক তোর নেই কোনো পাপ,
যত কলঙ্ক সে আমার, লাগুক যত অভিশাপ।
এ দেশের মানুষ খুঁজল না আমারে বুঝল না আজও কেউ,
এমনি যে কত সখিনা, আমেনা লুকায় কান্নার ঢেউ।
চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, আরও কত কি যে যাবে,
বড়ো ভয় জাগে মনে, আমি চলে গেলে তোর কিযে হবে?
আজও কতজনে কত কি যে বলে সয়ে চলি সব নীরবে,
এভাবেই একদিন দূরে চলে যাব কে আছে তখন ফিরাবে?
ছেলে কয় মারে যে যাই বলুক আমি তা মানি না,
দেশের জন্য কত কি করলি তুই যে আমার বীরাঙ্গনা মা।

# তুমি ছিলে তুমি আছ

মিয়া সালাহউদ্দিন

প্রতিদিন আমি তোমাকে দেখি
প্রতিদিন তোমার কথা শুনি
হয়তো ফসলের মাঠে
ধানের সোনালি শিষে
যখন সন্ধ্যার আবেশ নেমে আসে
নদীর জলে অন্ধকার নেমে আসে
মাঠের গরু গোয়ালে কৃষক উঠায়
আমি তখন আকাশে তারার মেলায় তোমাকে দেখি।

তোমাকে পাই আমি প্রকৃতির মাঝে
বটবৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায়
ভোরের সূর্যের আলোকিত আভায়-কী সুন্দর তুমি
মনে নেই কত ফাগুন-বসন্ত কেটেছে আমাদের দুজনার
কতো স্মৃতিমাখা দিনগুলো আজও মনে পড়ে
তোমার হৃদয় জুরে ছিল ভালোবাসার ডালি।

ফুল আর পাখি তোমার ভালো লাগত
তাল গাছের ডালে বাবুই পাখির বাসা বেঁধেছে
বসন্তের কোকিলের কুহুকুহু ডাক
ভালোবাসার নদীকে করেছে তোমার গভীর।

কত বছর চলে গেছে
পেরিয়ে গেছে কত ফাগুন-বসন্ত
কুয়াশার শিশির গাছের পাতায় টপ টপ করে পড়ে
আজও তুমি আছ তুমি ছিলে- ভালোবাসি তোমাকে।

# তমিজা খালার হেঁশেল

শেলী সেনগুপ্তা

কারওয়ান বাজার থেকে একটু সামনে এগোলে বাংলামোটরের আগেই দিলু রোডে যাওয়ার পথ। হাতিরঝিলের শুরু যেখান থেকে সেখানেই তমিজা খালার হেঁসেল। একটা চৌকির ওপরে বেশ কিছু হাঁড়িকুড়ি নিয়ে তমিজা খালা খাবারদাবার বিক্রি করে। এটাকে এককথায় গরিবের ফাস্টফুডের দোকান বলা যায়। সকাল থেকে রান্না করে হাঁড়ি ভর্তি খাবার নিয়ে চৌকির ওপর বসে থাকে, কেউ এলেই খাবার বেড়ে খেতে দেয়। তমিজা খালার কাছে কেউ এসে না খেয়ে ফেরত যায় না। যদি কারো কাছে টাকা না থাকে তাও খেয়ে যায়, পরে শোধ করে। যদি কেউ সংকোচ করে খাবার নাও চায়, তমিজা খালা বুঝতে পারে। তখন নিজেই ডেকে খেতে দেয়। বলে দেয়,

অহন খাইয়া যা, আতত ট্যাহা আইলে শোধ কইরা দিবি কইলাম।

তখন কেউ হয়তো বলে ওঠে,

একবার খাইয়া গেলে নি ট্যাহা শোধ করে?

হুম, মনে রাহিস, এইডা তমিজা খালার ট্যাহা, মাইরা খাওন এত সোজা না, এক্কেরে মা'র দুধ মুক দিয়া বাইর কইরা লমু।

যাকে খাবার দেওয়া হয়েছে সে জানে তমিজা খালা এমনই। তাই নীরবে খেতে থাকে।

দুপুর থেকে ব্যস্ত হাতে খাবার পরিবেশন করে, আর সামনে একটা বাটিতে টাকাগুলো জমা করে। খদ্দের চলে গেলে তমিজা খালা একা হয়ে যায়। তখন অলস চোখে ঝিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ দুপুরে ঝিলের জলে পা ডুবিয়ে একটা বক দাঁড়িয়ে থাকে। ওর চোখেও থাকে এমন অলস দৃষ্টি।

কেউ জানে না তমিজা খালার বাড়ি কোথায়, কে কে আছে। কখনো কেউ জানতেও চায়নি। আগ বাড়িয়ে কাউকে বলেওনি।

তমিজা খালার মেজাজকে সবাই ভয় পায়। কোনো কারণে খেপে গেলে প্রচণ্ড গালাগালি করে। এত অশ্রাব্য ভাষায় যে কোনো মহিলা গালি দিতে পারে তা ভাবা যায় না। কেউ কেউ দূরে দাঁড়িয়ে গালিগুলো উপভোগ করে, আর কেউ কানে আঙুল দিয়ে সরে যায়।

একবার এক মাস্তান টাইপের ছেলে ভরপেট খেয়ে টাকা না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। নিজের আসন থেকে তমিজা খালা হুংকার দিয়ে উঠল-

ওই মাদারের বাচ্চা, খাইয়া ট্যাহা না দিইয়া কই যাস?

সাথে সাথে সে তেড়ে উঠে জবাব দিলো, খাইলে ট্যাহা দিতে অইবো এইডা কেমুন কথা। দিতে অইবো না! খাওন কি তর বাফের ট্যাহায় কেনা?

অই বেডি বাফ তুইলা কথা কবি তো মুখ ভাইঙ্গা ফালামু।

কি কইলি শয়তানের পুত, আইজ তর একদিন কি আমার একদিন। কোন জমিদারের পোলা তুই তমিজা খালারে চিনস না।

বলেই পাশ থেকে একটা বাঁশ নিয়ে লাফিয়ে নামল চৌকির ওপর থেকে। হতভম্ব ছেলেটা ভোঁ দৌড় লাগালো। তমিজা খালাও দৌড়াতে দৌড়াতে ওকে এলাকার বাইরে দিয়ে এলো। এরপর থেকে ওই ছেলেকে আর এলাকায় দেখা যায়নি। সেদিন থেকে সবাই তমিজা খালার সাথে খুব সাবধানে কথা বলে। কেউ খ্যাপাতে চায় না। তবে অকারণে তাকে খেপতেও দেখা যায় না।

তমিজা খালার হেঁশেল থেকে একটু দূরে একটা বড়ো বটগাছ আছে। সেখানে সবসময় একটা লোক বসে থাকে। কারো সাথে কথা বলে না। এক মনে মাটির ওপরে কি যেন আঁকিবুঁকি করে। তমিজা খালা একটা থালায় কিছু খাবার সাজিয়ে নিয়ে যায়। লোকটা চুপচাপ খেয়ে নেয়। যতক্ষণ খায় তমিজা খালা সেখানে বসে থাকে, লোকটাকে দেখে, মাঝে মাঝে কোমর থেকে আঁচল খুলে চোখ মুছে। খাওয়া শেষ হলে যত্ন করে হাত ধুয়ে দেয়। তারপর থালা নিয়ে চলে আসে। কেউ কেউ বলে একমাত্র এই